খোয়াজ খিজিরের গপ্পো

: পরিবেষক :

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা ৷ ৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৮

প্রকাশক :

রুশো মিত্র

সাহিত্য প্রকাশ

৩০ জেমস লঙ সরণি

কলকাতা : ৩৪

মুদ্রাকর :

রেখা দে

শ্রীহরি প্রিন্টার্স

১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলকাতা : ৪

সূচীপত্র

কাঁকড়া

মাতলা ফুঁসছে। আকাশের মেঘ আর মাতলার চেহারা ছবু মিঁয়ার বুকে ভয় ধরিয়ে দেয়। সন্ধে হয়ে আসছে, বাড়ি ফেরার কথা। সাহস হয় না। ছবু মিঁয়া পাউখার মুখ ঘুরিয়ে দেয় নালার ভেতরে। সে একাই বৈঠা ফেলছে। ছপাত-ছপাত। দু'টি মাত্র প্রাণী। সে আর তার বউ মুন্নেসা বিবি। অন্যসময় মাঝে মাঝে তার সাথে থাকে হাফিজুর লস্কর। একই পাড়ায় বাড়ি। হাফিজুর একটু আধটু লেখাপড়া জানে। আর পাড়ায় মাতব্বরিও করে মাঝে মাঝে। তখন ফজলে মাস্টারের সাথে খুব ভাব। ফজলে মাস্টারের পেছন পেছন ঘুরঘুর করত। মধ্যে কিছুদিনের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিল হাফিজুর লস্কর। ফিরে এসেছিল একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায়। সেই থেকে ছেলেটা কেমন বোবা বনে গেল। খবর এসেছিল সাতজেলেতে ও সাজিদপুরে ভেড়ি দখলের লড়াইয়ে খুন হয়েছে সাতজন। মৃতদের মধ্যে মালিক পক্ষের কেউ ছিল না। যারা খুন হল তাদের গায়েই সেঁটে গেল সমাজবিরোধীর তকমা এবং অন্যাদের গণধোলাই। পুলিশও খুঁজে পেল না খুনিদের। পরপরই ফজলে মাস্টার পার্টিতে একটা উঁচু পদ পেয়েছিল। হাফিজুরকে রাজনীতির কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে—ওয়াক থুঃ! গা গুলিয়ে ওঠে, অন্য কথা বলো মাঝি। এবার হাফিজুর মিঁয়া আসেনি। ক্যানিং গেছে দাওয়াত খেতে। বড়ো খালার মেয়ের বিয়ে। নালার ভেতর অনেকটা ঢুকে একটা খাঁড়ি। খাঁড়ির পারের একদিকে এক ঝাড় হেঁতাল। আড়ালে লগি পুঁতে পাউখাখানা বাঁধে ছবু। মায়াদ্বীপ অন্ধকারে ডুবে গেছে। কয়েক ঝাপটা হাওয়ার পর আকাশ আস্তে আস্তে ফরসা হয়ে ওঠে। মায়াদ্বীপের গরাণ গাছের মাথায় উঠেছে পঞ্চমীর চাঁদ।

মাঝি একটু খাইয়া লও দিকিনি—মুন্নেসা হাঁড়ি থেকে জলভাত বের করতে করতে বলে।

—কী খামু?

—ক্যান, দুপুরের ভাত আর কাঁকড়ার ঝোল।

লণ্ঠনটা জ্বলছে দুরু দুরু বুকে। লণ্ঠনের আলোয় পাটাতনের ওপরে থালা রেখে তারা খাওয়া সারে। খাওয়ার পর মুন্নেসার গা ছেড়ে দেয় ক্লান্তিতে। সারাদিন কাঁকড়া ধরায় যা ধকল! চোখ বুজে আসে। মুন্নেসা পাটাতনের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। ছবুর ঘুমোলে চলবে না। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির। জেগে থাকতে হবে।

কলকেতে আগুন দিয়ে হুঁকা টানতে থাকে। খুশি খুশি ভাব, কাঁকড়া পেয়েছে ভালোই। মায়াদ্বীপের জঙ্গল অদ্ভুত-নিস্তব্ধ। রাত্রির ক্লান্তি আসে। হঠাৎ বন কেঁপে ওঠে— হালুম হালুন...... কোয়াক কোয়াক..... একঝাঁক পাখির পলায়ন। মুন্নেসার ঘুম ভেঙে যায়। জাপটে ধরে ছবুকে। ছবুর বুকে উত্তাপ বাড়ে। মনে পড়ে যায় দুপুরের কথা।

—দ্যাখো মিঁয়া, এই গর্তে একজোড়া কাঁকড়া আছে। ঝুড়ি কাদায় নামিয়ে ছবু মাথা নিচু করে দেখে—কি করে বুঝলি?

—তুমি মিঁয়া অ্যাখনও আগের মতনই আছ। অ্যাতদিন কাঁকড়া ধরলা—দ্যাখো এই পায়ের ছাপটা—মর্দা কাঁকড়ার। বুক চাপা হালকা ছাপ মাইয়া কাঁকড়ার। আর গর্তটা দ্যাখো, জোড়াটা খুউব বড়ো হবে। মুন্নেসা শিকের বঁড়শির মুখটা গর্তে ঢোকায়। শিকটা প্রায় পুরোপুরি ঢুকিয়ে গর্তের পাড়ে চাড় দিয়ে সুরুৎ করে টেনে আনে একজোড়া কাঁকড়া। ছবু মিঁয়ার চোখ চক্‌চক্‌ করে ওঠে। প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। পা দু'টো এক হাঁটু জবজবে কাদায় গেড়ে আছে।

—আরে মুনু, তুই তো কিল্লামাত করাইয়া দিলি। হংকং বাবুরা এক একটার দাম দিবে কুড়ি পঁচিশ টাকা। রাক্, রাক্—ঝুড়িটায় রাক্।

মুন্নেসা কথা বলে না। কাঁকড়া-জোড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মর্দা কাঁকড়াটা অন্যটারে বুকে বুক রেখে দাঁড়া দিয়ে আঁকড়ে রয়েছে। ছাড়ার কোনো তাগিদ নেই।

—কি হইল? রাক্।

—না। ছাইরা দিব।

—কস্ কি?

—দ্যাখছ না, এদের অ্যাখন সোয়াদের সময়। এই সময় অদের ধরলে বনবিবি গোসা করবে যে, আর কত কত গুড়া কাঁকড়া হবে জান? এরা মরলে আমাগো প্যাট বাঁচবে না। ছবু কথা বাড়ায় না। কাঁকড়া ধরা, কাঁকড়ার জীবন সম্বন্ধে মুন্নেসা অনেক বেশি বোঝে। তার মনেও কেমন একটা দুর্বলতা জন্মায়। মুন্নেসা নিজের খেয়ালে কোমরে জড়ানো তামার তারটা খুলে নেয়। ফকিরের দেওয়া। ওদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। তারের গুণে নাকি মুন্নেসা মা হতে পারবে। ঘরময় ঘুর ঘুর করবে একটা ছোট্ট ছেলে। মুন্নেসা তামার তার থেকে দু'টুকরো ভাঙে। বাঁশের চিমটে দিয়ে চেপে ধরে, এক একটা কাঁকড়ার বড়ো দাঁড়ে তার পেঁচিয়ে দেয়। ছবু মিঁয়ার মনে পড়ে যায়, শাদির সময় বহু কষ্টে দু'আনার সোনার আংটি দিয়েছিল মুন্নেসাকে। সোনা বলতে ওইটুকুই! সব মেয়েরেই সোনার ওপর একটা অন্ধ আদিম দুর্বলতা থাকে, আর মুন্নেসার কাছে আংটিটা ছিল বড়ো সোহাগের। সেবার বানের জলে ভেসে গেল তাদের সব কিছু আর পেটের দায়ে মুন্নেসার আংটিটা। হাসি

মুখে নিজেই দিয়েছিল। কিন্তু ছবু তার ভেতরের কান্নাটা দেখতে পেয়েছিল। দ্যাখো মিঁয়া, কাঁকড়া জোড়ারে আংটি পইরে দিলাম। চলো, মাতলার পানিতে ছাইরা দেই। ছবু কথা বাড়ায় না।

মুন্নেসাকে বুকের আরও কাছে টেনে নেয় নৌকার পাটাতনের উপর।

—না মিঁয়া, ছাইরা দেও। বেগুণা হবে। নৌকার ওপর একাজ করলি বনবিবি আমাগো অমঙ্গল করবে। ছাড়ো, দেবী কিন্তু সব দ্যাখছে।

কিন্তু ছবু মিঁয়ার বুকে তখন জোড়া কাঁকড়ার আগুন। নৌকা দুলে ওঠে আর নেচে ওঠে খাঁড়ির জলতরঙ্গ।

দুই

—ছবু, তুই হারামের কাজ ছেড়ে দে। আমরা হলাম আল্লার বান্দা। আমাদের কাঁকড়া খাওয়া নিষিদ্ধ। কিতাব তো পড়িসনি, জানবি কী করে। আচ্ছা ছবু, তোরা অন্য কাজ তো করতে পারিস। সামান্য ক'টা টাকার জন্য শয়তানের বান্দা হবি? ছবুদের মাটির দাওয়ায় বসে ছগন আলি তাকে বোঝাচ্ছিল। স্থানীয় মসজিদের মাতোয়ালি, উত্তর থেকে এসেছে। তার কথায় ছবুর মনে ভয় জন্মায়।

গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর ছবু-মুন্নেসার। বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছগন আলির কথাগুলো শুনছিল মুন্নেসা। ইচ্ছা হয় জিজ্ঞেসা করে— বাঁচব ক্যামনে? কাঁকড়া ধরার আগে নসু শেখদের জমিতে খেতমজুরি খাটতাম। প্যাট বাঁচেনি। সামান্য জমিটুকু প্রথমে পড়ল বন্ধক, পরে পুরোপুরি কবলা। নসু শেখরা গ্রামের আরও অনেকের জমি কিনে মাছের ভেড়ি বানাইছে। বি.এল.আর.ও. বাবু আসেন মাঝে মাঝে ভেঁড়ি দেখতে। তাদের খুউব খাতির— ধান জমিতে হল ভেড়ি। চিংড়া বিদেশে যায়। হুজুর তখনও এখানে ছিলেন। কিছুই কন নাই। আর কবেনই বা কী কইরা, নসু শেখদের বাড়িতে আপনারও তো খাতির কম নাই। কিন্তু মুন্নেসা কিছু বলতে সাহস পায় না। ছগন আলি চোখের সামনে তো কম সংসার ভাঙেনি। তার চলা ফেরা বড়ো রহস্যময়।

—চলি রে ছবু। আল্লার বান্দা হয়ে খোদার দুশমনি করিস না, বেপদ হবে। সেরফানখান গলায় এক প্যাঁচ দিয়ে চলে যায় ছগন আলি।

বৈশাখে বেশ জাঁকজমক করে বনবিবির পুজো হয়। গ্রামের পশ্চিম দিকে মাতলার পাড়ে বনবিবির থান। হোগলাপাতায় ছাওয়া দোচালা মন্দির। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই বনবিবির পুজো দেয়। হিন্দুরা দেয় ফলমুল আর মুসলমানেরা সিন্নি। বনের দেবী বনবিবি। মাউলি এবং জেলে-জোতাদের কাছে বড়ো জাগ্রত দেবী! বাঘের থাবা থেকে বেঁচে আসা নাড়ু ঢালিকে নাকি সাক্ষাৎ বনবিবিই বাঁচিয়েছে। সে এক কাহিনি। দলের থেকে নাড়ুকে টেনে নিয়ে গেল

দক্ষিণরাই। বাকিরা প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। হঠাৎ সারা বন আলোয় আলোময়। তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম, বাঘ বেচারিরও একই অবস্থা আর কী। কিছুক্ষণ পর আলো মিলিয়ে গেল, বাঘ নেই। নাড়ু রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। মানুষের জীবনের বড়ো মায়া। বনবিবির পুজোর ধুমধামও বাড়ে। পুজো উপলক্ষে সাতজেলে আর আশেপাশের গ্রামের প্রচুর মানুষ জড়ো হয় থানে। পাঁচু সর্দার এ তল্লাটের একাধারে মহাজন আর নৌকার মালিক। ডিঙি আর পাউখা মিলিয়ে নাও আছে খান বিশেক। সে-ও এসেছে।

ছবু, মুন্নেসা আর হাফিজুর লস্করকে নিয়ে এবারও তিনজনের দল। যদিও ছবু তাদের বড়ো মাঝি, কিন্তু মুন্নেসাই ওদের চালায়। ছগন আলির মোটেই সেটা পছন্দ নয়। সাতজেলের থেকে অনেকগুলো দল যায় চামটা, মায়াদ্বীপে কাঁকড়া ধরতে। অন্যদের সাধারণত সাত আট জনের দল। পাঁচু সর্দার পুজোর মধ্যেই মহাজনি কারবার সেরে নিচ্ছিল।

—অ ছবু, কাঁকড়া ধরতি যাবিনি?

—হ খুড়ো। এবার একখান ডিঙি দিয়ো দিকিনি।

—ডিঙি লিবি, দাদন লিবিনি?

ছবু মুন্নেসার দিকে তাকায়। পাঁচুর অভিজ্ঞ চোখ এড়ায় না তাদের চোখের চাউনি। ছবুরা আজকাল অনেক সময় তার কাছ থেকে দাদন নেয় না। কাঁকড়া-শিকারি গ্রামে হংকং, জাপানিবাবুদের আনাগোনা। তারাই দাদন দেয়। সুদের হার অনেক কম এবং দাদনের পরিমাণও অনেকটা। শর্ত একটাই—বড় সাইজের কাঁকড়া চাই। প্লেনে চড়ে হংকং, জাপান, মালয়েশিয়া পাড়ি দিচ্ছে কাঁকড়া। ডলারের ছোঁয়া লেগেছে কাঁকড়া-শিকারিদের জীবনেও। এখন সমুদ্রে কাঁকড়া ধরার অনেক নতুন হাত। হংকংবাবুরা মাথার কাঁকড়া বেছে নেওয়ার পর ঝড়তি পড়তি কাঁকড়া যায় ক্যানিং আড়তে। তাও দালাল, ফড়িয়া, আড়তদার হয়ে খদ্দের। পাঁচুদের একটা চাপা রাগ আছে হংকং বাবুদের ওপর। কে সহ্য করতে পারে ব্যবসায় সতিনদের?

—ডিঙি লিবি, ঠিক আছে। ডিঙির ভাড়া পড়বে দুশো টাকা পেত্যেকদিন। আগাম।

অন্য দলের বড় মাঝি যতীন গড়ুই তাদের কথা শুনছিল। তাদেরও ভাড়া ডিঙি দরকার। তার কানে টাকার পরিমাণটা ধাক্কা খায়!

—কও কি খুড়ো? আগের গোনে ডিঙি ভাড়া তো নিলা দেড়শো টাকা করে?

—হ, ঠিকই কইছিস। আমাগো কথাও একটু ভাইবো কচি। শালের দাম ক্যামন আকাশ ছোঁয়া। প্যাট তো আমাগোও আছে, নাকি? ডিঙি লাগলে নিবি, না লাগলে নিবি ক্যানে? তোগো আইজকাল তো বুদ্ধি দেওয়ার অনেক মাথা আছে।

দ্যোন ফেলে ছবু মাঝি গলুইয়ের ওপর বসে আছে। দূরে দূরে বেশ কয়েকটা ডিঙি মায়াদ্বীপ ঘিরে রেখেছে। সাতজেলের থেকে আসা জেলেরাই বেশি। অমাবস্যার কোটালে কাঁকড়া পড়ে খুব। জোয়ারের জলে গর্তের কাঁকড়া বেরোয় খাবারের খোঁজে। পেটই আসল কথা, কাঁকড়ার জীবনেও ব্যতিক্রম নেই। শুধু খাবারের জন্য কাঁকড়া কাঁকড়াদের খুন করে না, যা মানুষ করে। বাঁচার, সঞ্চয়ের লড়াই তো প্রাচীন ব্যাধি। এক একটা মন্বন্তর নাকি খাদ্য ঘাটতি থেকে নয়, উদ্‌বৃত্ত থেকে। কাঁকড়ারা অত সব বোঝে না, খাবারের গন্ধ পেলেই সুড় সুড় করে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। লম্বা নাইলন দড়ি থেকে এক-দেড় হাত অন্তর ঝুলে থাকে টোপ। ফাঁসে আঁটা শুট্‌কী মাছের টুকরো। কাঁকড়ার প্রিয় খাদ্য—মরণ ফাঁদ। বাঁশের সাথে দড়ির একটা দিক বাঁধা, অন্যদিকে ডিঙি। এক দেড় ঘণ্টা পর পর দ্যোন তোলে ছবুরা। ডিঙির দিকে দড়ি আস্তে আস্তে তোলে। লোভী কাঁকড়াগুলি দাঁড় দিয়ে শক্ত করে কামড়ে থাকে টোপের দড়ি। টোপের ভার থেকে জেলেরা হাতে টের পায় কোন্‌টায় কাঁকড়া আছে, আর কোন্‌টায় নেই। ডিঙির কাছে আসতে ছাঁকনি জাল দিয়ে ছেঁকে তুললেই হল। বেশ কয়েকবার দ্যোন তুলেছে ছবু মিঁয়া। কাঁকড়া পড়ছে না একদম। গলুই-এ ছবু মাঝি গুম মেরে বসে আছে। হাফিজুর খোল থেকে জল সেচতে সেচতে বলে—মাঝি, গোসা করছ ক্যানে?

ছবুর কোনো ভাবান্তর হয় না। চুপচাপ বসে থাকে। ডিঙির গায়ে জল ভাঙা ঢেউ ছলাত ছলাত। সন্ধ্যা নেমে এলো। সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া হল প্রায় নিঃশব্দে। মুন্নেসার বুকে শঙ্কা বাড়ে। বাড়ি থেকে আসার আগে ছগন আলি এসেছিল। দূরে ডেকে নিয়ে কী সব ফিশফিশ করে বলছিল ছবুকে। ছগন আলিকে দেখলে মুন্নেসার বড় ভয় হয়। লোকটার চোখ দু'টো কেমন সরীসৃপ-শীতল।

আলো-আঁধারে মায়াদ্বীপ বড় রহস্যময়। আঁধার ভেঙে হঠাৎ শোরগোল ওঠে। হাফিজুর হাঁক দেয়—পালান মাঝি, কি হইছে?

—নায়ে বাঘ পড়েছে। বাঘ।

—কার নায়ে?

—সতু খুড়ার নায়ে। গনারে নিয়া গেছে।

—পাপে দ্যাশটা ভরে গেছে। দক্ষিণরাই কাউরে ছাড়বে না। ছবু মিঁয়া বিড় বিড় করে কী সব বলে।

দাওয়ায় ভাত দিতে দিতে মুন্নেসা ছবুর দিকে তাকায়—মাঝি, তুমি রাগ করছ ক্যান?

—তুই বুঝিস না? হাফিজা হারামিটার সাথে তোর অত পিরিত ক্যান?

—মাঝি, কও কি? আল্লার কছম, ইসব কথা মাথায় আইনো না।

—মুই কই? সব্বাই কয়। তলে তলে রস খাও, ভাব কিচ্ছুটি বুঝি না? ছগন হুজুর তোগো পিরিতের কথা সব কইছে।

—তুমি ছগন আলির কথা বিশ্বাস কর?

—কি কইলি মাগি, ছগন হুজুর মিথ্যাবাদী? তুই সতী না? তোরে তালাক দিলাম।

—মাঝি, ইসব মিথ্যা, সব মিথ্যা—মুন্নেসা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

হ, তোরে তালাক দিলাম। তালাক তালাক তালাক। তিন তালাক দিলাম। বাড়ি থাইক্যা বেরিয়ে যা!

তালাক শব্দটা চারদিকে ধ্বনিত হতে থাকে। মুন্নেসা বিবির কানের ভেতর থেকে গভীর ভেতরে। ছবু মিঁয়ার মনের গভীরে.........

তিন

—ও মাঝি, চুপচাপ বসে আছ ক্যানে?

পা দু'টো ছড়িয়ে মাথা নিচু করে বসেছিল ছবু মিঁয়া। পাশেই শিক আর ঝুড়ি। দু'একটা ছোটো কাঁকড়া। মাথা তোলে—অ তুই! বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে মুন্নেসা। পরনে সবুজ ডোরাকাটা শাড়ি। নিজেকে সামলে নেয়। অ্যামনিই বইসা আছি।

—আরে, তোমার হইছে কি? পায়ের পাতা যে রক্তে ভাইসা গেছে।

—না, অ্যামন কিছু হয় নাই। গজলায় চিরে গ্যাছে।

—দাঁড়াও মাঝি, বনসুলির পাতার রস দিয়া দেই। সেরে যাবে।

—না, না, তুই ক্যানে দিবি?

—ক্যানে মাঝি, মোর ওপর তোমার রাগ এখনও পড়ে নাই?

ছবুর বুকের মধ্যে মোচড় দেয়। বুকের যন্ত্রণাটা বাড়ে। মুন্নেসার কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। রাগ ভাঙতেই মনে হয়েছিল মুন্নেস ছাড়া তার আর কে আছে। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। ছগন মাতোয়ালির রায়—তালাক শরিয়ত অনুসারে হালাল। মুন্নেসা তখন তিনমাসের পোয়াতি। পেটে মায়াদ্বীপের সন্তান। কোনো এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়র বাড়িতে উঠেছিল। তারাই হাফিজুরকে অনেক বুঝিয়ে মুন্নেসার সাথে বিয়ে দিয়েছে। হাফিজুরও কি কম চেষ্টা করেছে ছগন আলির মত পালটানোর জন্য। ছগন আলির এককথা—তোরা কি চাস আমি খোদার আইনের বিরোধিতা করি? তালাকের পর ছবুর এই প্রথম কাঁকড়া ধরতে আসা। অভাবী শরীরও আর টানে না। বনসুলির পাতা হাতে ঘষে মুন্নেসা ছবু মিঁয়ার কাটা জায়গাটায় চেপে ধরে।

—অ্যাখন আর কাঁকড়া ধরতি আস না ক্যান মাঝি?

—কি করমু কাঁকড়া ধরে? কোনোরকম বাঁচলেই তো হইল।

—না মাঝি, তোমার শরীলটা একদম পইড়া গ্যাছে। একটা শাদি করো। ভালো দেখে একটা মাইয়া আইনবা, দ্যাখাশুনা করতে পারবে।

ছবু অসহায় দৃষ্টিতে মুন্নেসার দিকে তাকায়।

—মাঝি, পোলাটারে দেখতে গ্যালা না তো একদিনও। ছোটো মাঝি তো কয়, ও তোমার পোলা। ছবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে!

—তা মাঝি, কার সাথে আইছ?

—সতু মাঝির নায়।

—কাঁকড়া তো ধরতি পার নাই একটাও! দাঁড়াও, তোমারে কয়টা কাঁকড়া দেই। মুন্নেসা বাঁশের চিমটা দিয়ে কাঁকড়া তুলতে গেল ডালা থেকে।

—না, থাউক্। তুই ক্যানে আবার দিবি?

—মোর কাঁকড়া নিবা না মাঝি? আচ্ছা চলো, এক সাথে কাঁকড়া ধরি। গর্ত থেকে মুন্নেসা এক একটা ধরে। ছবু মাঝি ঝুড়ি এগিয়ে দেয়। হাঁটতে হাঁটতে একটা গরাণ গাছের গোড়ায় আসে। ঢালুতে বড়োসড়ো একটা গর্ত। মুন্নেসা শিক ঢুকিয়ে দিয়েই টেনে তোলে মস্ত বড় একটা কাঁকড়া।

—জান মাঝি, গর্তে আরও একটা কাঁকড়া আছে।

ছবু মিঁয়ার কানে সে কথা যায় না। চোখের সামনে কাঁকড়াটা দাঁড়া উঁচু করে রয়েছে; দাঁড়ার গোড়ার দিকে তামার তার বাঁধা। একটু একটু শ্যাওলা ধরেছে।

—দ্যাখো মাঝি, এই কাঁকড়াটার দাঁড়ায় তামার আংটি পরানো। মুন্নেসা কাঁকড়াটাকে এনে আগেরটার পাশে রাখে। দু'জনের চোখ স্থির হয়ে যায়। চেনা গরাণ গাছের নিচে কাঁকড়ার ঘর, তারা কাঁকড়া দু'টোকে ছেড়ে ছিল মাতলার জলে। খেলাচ্ছলে ছবু মর্দাটাকে ছেড়ে দিয়েছিল অনেক দূরে। কাঁকড়ার সংসারে ছাড়াছাড়ি চেয়েছিল সেদিন।

তারপরেই পাগলের মতো মুন্নেসার হাত জড়িয়ে ধরে ছবু। মায়াদ্বীপের নিস্তব্ধতা ভাঙে তার জড়ানো স্বরে.........মনুবিবি, মোর ঘরে ফিরয়া আয়........।

তুমি ক্যানে মোরে তালাক দিলা মাঝি—মুন্নেসার বুক ভেঙে যায় উথলে-ওঠা কান্নায়। ছলাত ছল জল ভাঙে মাতলার পাড়ে।

নেংটিছেঁড়া ঘাটের বৃত্তান্ত

নেংটিছেঁড়া ঘাট ইতিহাস খ্যাত কোনো ঘাট নয়। যাত্রী পারাপারের ঘাট। সারাদিন মাঝি মল্লার হাঁকডাক। নৌকার নীচ দিয়ে ভূটান থেকে ধেয়ে আসা জল সুড়ুৎ করে বাংলাদেশের বুকচিরে নেমে যায় সাগরে। এটাই রোজনামচা। কবে থেকে কেউ জানে না। যেমন নেই তার কোনো আনুষ্ঠানিক জন্মদিন।

সৌকলিন আর ঋত্বিমার সাথে সিঙ্গিমারি নদীটা জড়িয়ে যাওয়ার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। চাকুরি সূত্রে কলকাতা থেকে ইতাসি ব্লকে আসা। পেটের দায়ে আসা। সরকার বাহাদুর দক্ষিণ থেকে সরাসরি উত্তরবঙ্গে পাঠিয়েছেন। একেবারে অগত্যা মধুসূদন নয়। দূর্বাদির কথা কি কম কাজ করেছে তার ইতাসি ব্লকে আসার পিছনে। বলেছিল—সৌকলিন গ্রামে যাও, দেখবে আমরা দ্বান্দ্বিক সমাজ গড়ছি। দ্বান্দ্বিক সমাজ কি? সৌকলিন তখন বোঝেনি, বোঝার ইচ্ছাটা তাড়িয়ে বেড়াত। দ্বান্দ্বিক সমাজ, পেট, বাবার অসমর্থ চেহারা সাজানো থাকত একটা রিলে। সুযোগ যখন এলো একটু ভালভাবেই এলো। চন্দনের ভাষায় সে হয়ে গেল আমলা। চন্দনের বাবা একটা কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার। ও স্বপ্ন দেখে একটা নতুন সমাজ গড়ার। পোষ্টিং পেয়ে কোনো খোঁজ খবর ছাড়াই চলে এসেছিল ইতাসি ব্লকে। রাতদিন ট্রেন জার্নি। শেষে বাসে সন্ধ্যা সাতটায় পৌঁছাল নেংটিছেঁড়া ঘাটে। ওপারে বিডিও অফিস। তারা এসেছে শেষ বাসটায়। সেটা আর রাতে ফিরবে না। ওটাই পরের দিন ফাস্ট বাস। রাস্তার দু'পাশে কয়েকটা গুমটি। তারই একটা হোটেল ও রাতে ড্রাইভার-কন্ডাকটারদের আস্তানা। এক পেট রুটি আর চোলাই টেনে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া। কোনোদিন জুটে যায় নারী মাংস। শেষ বাসে আর যাত্রী ছিল না। ডিঙি নৌকায় ঋত্বিমা চুপচাপ বসে আছে। শুক্লপক্ষের রাত। বর্ষার সবে শুরু। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। পাহাড়ি জল নেমে যাওয়ার হিস হিস শব্দ। সৌকলিন জিজ্ঞেস করে—ভয় পাও না মাঝি?—ভয় পাব কিসের লাইগ্যা। বাপ কইত—নসিরাম নদীতে নামার আগে মশানদ্যাবের ভাব দিকবি। ভাব ভাল ঠেকলে নদীতে ন্যামবি। অ্যাক অ্যাক অমাবস্যায় নদী ঋতুবতী হয়। ভাও বাতাস বয়। আকাশে থাকে বৃষ্টির ম্যাঘ। নদী ফুইল্যা ওঠে। তখন মশানদেব আসে নদীতে সোহাগ করতি। ঐ সময় জলে নামলে কাউরে ক্ষমা করে না মশানদেব। কত মাঝিরে যে লইয়া গেল সিঙ্গিমারি। ভাও বাতাস চিনতি না পারলেই শ্যাষ। মোর বাপটাও পারে নাই ভাও বাতাস চিনতি।

চৈত্র মাস। ভ্যাপসা গরম আর ক্লান্তি। সেই সময়টাই ইতাসিতে জমে ওঠে রঙ্গ। বাড়ে চেরি রঙের মারুতি এস্টিমের আনাগোনা, বংশীলাল চৌধুরীরা নেংটিছেড়া ঘাটের পাটনী। কোনো এক পূর্বপুরুষ এসেছিল দাঁড় টেনে বৈঠা বেয়ে পয়সা আয় করতে। এখন বার্ষিক টার্ন ওভারে হিসাব নিকাশ। শুধু চৈত্র মাসটা বুঝে নেওয়া, তারপর পালাক্রমে নাও চালাও। নাও চালানোটাই আসল কথা। স্রোত বুঝে গতি মাপতে হয়। চৌধুরীরা তা ভাল বোঝে। রবিবার সকালের দিকে মারুতি এস্টিমটা এসে থামল কাঁঠালতলা বি.ডি.ও. অফিস সংলগ্ন মাঠে। বিডিও কোয়ার্টারের পাশে। সি.ডি. ব্লক। পুরানো কোয়াটার স্যাঁত স্যাঁতে, রংচটা। এটাই বিডিও-র রেসিডেন্স কাম রেসিডেনসিয়াল অফিস। চৌধুরী একা বসে আছে। সৌকলিন ঢুকতেই উঠে দাঁড়ায় বংশীলাল।—নমস্তে ছ্যার, হামি পাটনী বংশীলাল চৌধুরী। হাপনার সাথে দেখা করতে এলাম। সৌকলিন চৌধুরীদের কথা শুনেছে। কয়েক পুরুষের ব্যবসা। অবশ্য ব্যবসাটা ভাইদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। চার ভাই পালাক্রমে ঘাট চালায়। তবে সব ধরনের যোগাযোগ রাখে বংশীলাল। পাশাপাশি তামাকের মহাজনি কারবার। ইতাসি ব্লক তামাকের জন্য বিখ্যাত।

ফুলমতি চা দিয়ে যায়। ফুলমতি স্থানীয় মেয়ে। সৌকলিন—নিন চা খান। বলুন, কি ব্যাপারে এসেছেন।

—ছ্যার, সাহেবরা নতুন এলে হামাদের গরীব মোকামে একবার না একবার যানই। আপনি মেম সাহেবকে লিয়ে কবে যাবেন।

—ধন্যবাদ, এখন তো যাওয়া সম্ভব নয়, পরে দেখা যাবে।

—গ্যালে খুশি হতাম ছ্যার। তবে একদিন কিন্তু যেতেই হোবে। আর ছ্যার চৌতমাস তো এলো, ঘাটের ব্যাপারে কিছু ভাবলেন।

—হ্যাঁ, ডাক হবে। নোটিশ দেওয়া হবে ঠিক সময়ে।

—ওতো সাব কাগজের কথা বললেন।

—তার মানে?

—না ছ্যার, তেমন কিছু নয়, হামরা গরীব পাটনী। ঘাট থেকে আমাদের রুটি রোজগার। আপনি না দেখলে আমাদের কে দেখবে। সাহেবরা আসেন, তারা আমাদের দেখেন, হামরা ভি সাহেবদের একটু দেখি।

চৌধুরীবাবু, ঘাটের ইজারা আপনি পেলে আমার তো কোনো আপত্তি নেই।

—লেকিন আপনি তো নতুন এসেছেন, সোভাপতি সাব সব জানেন। ওনি কিছু বলেননি আপনাকে?

সৌকলিনের কথাটা কেমন আপত্তিকর মনে হয়। ঘাট ডাকের ব্যাপারে সভাপতির নতুন কি কথা বলার থাকতে পারে। প্রতি চৈত্র মাসে সরকারী ঘাট ডাক হবে এটাই তো নিয়ম। প্রবেশনে দু'বছর তাহলে কি শিখেছে। সৌকলিন

বলে—না সভাপতির সাথে এ ব্যাপারে এখনও কথা হয়নি। চৌধুরীবাবু আমার একটু তাড়া আছে। সৌকলিন ঘড়ি দেখে। চৌধুরী বিডিও-র মুখের দিকে তাকায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওঠে—আচ্ছা চলি ছ্যার, পরে আবার আসব। চৌধুরী চলে যায়। পরনে ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবী, ধুতি। চর্বির আধিক্যে থল থল করছে শরীর। পাঞ্জাবীর রংকে কোথায়ও ছাপিয়ে গেছে গায়ের কালো রঙ। জ্যাবজ্যাবে। সৌকলিনের পাটনী মাঝিদের সম্মন্ধে ধারণাটা ধাক্কা খায়। ছপাত ছপাত বৈঠা ফেলা মাঝিদের গায়ে মাংস জল তরঙ্গের মতো থল থল করে এমনটি সে কোনোদিন দেখেনি।

নিপেন বর্মন সটান চেম্বারে ঢুকে পড়লেন। দু'একবার আগেও কথা হয়েছে। প্রথমে পরিচয়, সহযোগিতার আশ্বাস। এবং ধারাবাহিকভাবে চেপে বসা। এটা নেতাদের কাজ। নিপেন ব্লক কমিটির সেক্রেটারি। তার আর একটা পরিচয় আছে। সে গনসা বর্মনের ছেলে। গনসা বর্মন ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম সভাপতি। তার সম্বন্ধে এখনও অনেক গল্প চালু আছে। সেবার তো ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে গেছিল। বিডিও হয়ে এসেছিলেন কান্তিময় হীরা। সবে জয়েন করেছেন—সটান বিডিও-র চেম্বারে ঢুকে বসে পড়লেন গনসা বাবু। হু আর ইয়ু। বলতেই গনসা বাবু লাফিয়ে উঠলেন—কি বললা খোকা? আমি শুয়ার। আমি তোমার বাপ, বুঝলা। লোকটা সত্যিই অফিসারদের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। প্রশাসন তার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত। কি বলতে কি বলে ফেলেন। তার দাবীর আগে মিমাংসা। সভাপতি ছিল নিরক্ষর। তার অভাব ছিল কিন্তু সততা প্রশ্নাতীত। নিপেন বাবু তার গণতান্ত্রিক বংশ তন্ত্রের উত্তরাধিকারী। ভারতের মতো দেশে এই তকমাটাই বড় বেশি প্রয়োজন। কি ডান্ কি বাম। নিপেন বাবুর আর অভাবের সাথে লড়াই নেই। সে বড় কারিগর। স্রোত চেনে। নিপেন বাবুই শুরু করলেন—বিডিও সাহেব ঘাট ডাকের নোটিশটা দিয়ে দিলেন?

—কেন বলুন তো।

—না, তেমন কিছু না। চৌধুরীরা তো ঘাট ভালই চালাচ্ছে। নিরাপদে পারাপার হওয়া যায়। এক লক্ষ লোকের জীবন ওদের হাতে।

—সভাপতি সাহেবের সাথে কথা হয়েছে। ডাক যে পাবে তাকেই তো দায়িত্ব নিয়ে পারাপার করতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতির আয়ও বাড়বে।

—শুনেছি আপনি সভাপতির আপত্তি শোনেননি। তাছাড়া আমাদের কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে চৌধুরীদেরই রাখতে হবে।

—নিপেনবাবু, চৌধুরীরা পাক বা যেই আসুক আমার কোনো আপত্তি নেই। তাকে শুধু হাইয়েষ্ট অকশনার হতে হবে। পাশাপাশি ঘাট চালানোর অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা আছে নাকি সেটাও আমরা বাজিয়ে নেব।

—আপনি কি ভাবছেন সেটা আপনার ব্যাপার। আমাদের পার্টিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে চৌধুরীদের পক্ষে। আশা করি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে কাজ করবেন। আগের বিডিও-রা তো কাগজপত্র বানিয়ে নিত। নিপেন বর্মন কথাগুলো বলছিলেন আদেশের সুরে।

জিপ বালির চরের উপর দিয়ে চলছিল। দু'পাশে তিরতির করে বয়ে চলা তরমুজ গাছ। সারা চর ছেয়ে আছে গাঢ় সবুজ তরমুজে। মধ্য দিয়ে পথ। ছোট গাড়ি চলাচলে বালিতে রেক বসে গেছে। গাড়িটা বর্তমান ঘাটের কাছে দাঁড়াল। বাঁ দিকে বসে ড্রাইভার, ডানদিকে সৌকলিন। নাইন্টিন সিক্সটি টু-র উইলিজ। বাঁ হাতি ড্রাইভিং। কত কিছু পাল্টালো, পাল্টায়নি গাড়িটা। ওর দম নাকি অনেক। সৌকলিনের ধারণা গাড়িটা একটা বৃদ্ধ হাতি। যখন তখন স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। কোনোদিন তো তাকেও গাড়ি ঠেলতে হয় মাঝপথে। একবার ভেবেছিল বসিয়ে দেবে। ভাড়া করা গাড়ি নেবে। রাজি হয়নি ড্রাইভার। ড্রাইভার ইউনিয়ন ছোটখাটো ডেপুটেশন দিয়ে গেছে। সৌকলিনের সমস্যা তেলের হিসাব কিছুতেই মিলাতে পারে না। তেলটাই তো সব। আর সরকারী গাড়ির ব্যামো—মাসে তিনবার গ্যারেজে পাঠাতে হয়। মোটা মোটা বিল। মাড়টা সবে ওপারে গেছে। আসতে দেরী হবে। মাড়ে পাশাপাশি দু'টো বড় নৌকা বাঁধা। জোড়া নৌকায় পাটাতন। তার উপর ছোটগাড়ি, রিক্সাভ্যান উঠে যায়। সাত আটজন মাঝি কাজ করে শুধু মাড়েই। আর দু'টো গোটা এক একটা দেশী বড় নৌকা। যাত্রী পারাপারের জন্য। দু'পারে চর। প্রায় দু'কিলোমিটার বিস্তৃত। নৌকায় জীপ পারাপার চলে জানুয়ারী মাসের শেষ থেকে মে মাসের মাঝামাঝি। কোনোবার তার আগেই জল এসে যায় কলকল রবে। পাহাড়ী ধারা। বৃষ্টি বাদল নেই অথচ নদীটা হয়ে যায় দু'কিলোমিটার চওড়া। ব্যাস, জীপ যাতায়াত বন্ধ। নদী ফোঁসে, এখানে লাশ পাওয়া মুশকিল। চলে যায় বাংলাদেশে। প্রায় ওপারেই মহকুমা সদর। তখন বাই রোডে যেতে হলে দেড়শো কিলোমিটার ঘুরে যাও। তেলটাই তো সব।

—নমস্কার ছ্যার। মুই কাউয়্যা। আঠারোজানি মোর ঘর।

—কাউয়্যা!

—হ্যাঁ স্যার, ওর নাম কাউয়্যা। আগের সাহেবরা ওকে সবাই চিনতেন। ও মাছের ফড়িয়া। সারাদিন নদীর পারে পড়ে থাকে। দেখছেন না গায়ের চামড়া কেমন পুড়ে গেছে রোদে। কাকের মতো তাকিয়ে থাকে নদীর দিকে। দেখছেন না কেমন কুঁজো হয়ে গেছে। এখন আর কোমর সোজা হয় না ওর। আসল নাম ও নিজেও জানে না। গত ইলেকশনে তো একটা কাণ্ডই ঘটেছিল। সেন্ট্রাল অবজারভার এলো আমাদের কেন্দ্রে। অবজারভার মানে তো রাজার জামাই। পান থেকে চুন খসলে চলবে না। চৌধুরীরা একটা এয়ার কাণ্ডিশান্ড গাড়ি দিয়েছিল।

মিনারাল ওয়াটার এলো পেটি পেটি। বাংলার জলে নাকি থিক থিক করছে ভাইরাস। একজন অবজারভার নাকি অ্যাকুয়াগার্ডের জলে স্নান করেছিল। কলকাতা থেকে এলো গাঙ্গুরামের রসগোল্লা। আরো কত কি। কিন্তু মুশকিলটা বাঁধল অন্য জায়গায়। রাত ন'টায় রেডিওগ্রাম এলো। পরের দিন অবজারভার আসবে বুথ দেখতে। লাঞ্চ করবেন। সঙ্গে মেনু লিষ্ট। অবজারভার প্রবাসী বাঙালী, সিনিয়র আই.এ.এস. অফিসার। প্রায় নিরামিষী। কার কাছে শুনেছেন উত্তরবঙ্গে বোরলী মাছ বিখ্যাত। উনি বোরলী মাছ খেতে পারেন। বুঝুন ঠ্যালা। আমিষ খেলে না হয় তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করা যায়। রূপোলী বোরলী মাছের আদৌ তখন সিজনই নয়। সে এক হুলস্থুল কাণ্ড। কোথায় পাওয়া যায় বোরলী মাছ। কাউয়্যার ডাক পড়ল। তখন বিডিও ছিলেন সোম সাহেব। কাউয়্যার কাছে ইংরেজীতে চিঠি গেল—ইলেকশন আর্জেন্ট। ড্রাইভার বলে চলে—কাউয়্যার সাথে গ্রামের মান সম্মানের প্রশ্ন। গোটা আঠারোজানি গ্রাম সেই রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে।

চেনা মারুতি, মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে। এস.ডি.ও. সাহেবের চেম্বারে ঢুকতে ঢুকতে সৌকলিন শুনতে পেল—ছ্যার, আপনি বিডিও সাবকে একটু বুঝিয়ে বলু.......। সে ঢুকতেই কথাটা থেমে গেল। কিছুক্ষণ পর বংশীলাল চৌধুরী চলে গেল। অনেক ব্যাপারেই সৌকলিনের বেশ অবাক লাগে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পাওয়ার সময় সিনেমা হলে চলছিল—বসুন্ধরা। সৌমিত্র বিডিও-র ভূমিকায়। আর হাজি সাহেব? না, সেটা তখন শুধু সিনেমাই মনে হয়েছিল। বন্ধুরা বেশ মজা করত—দেখিস, তুই যেন আবার সৌমিত্র হয়ে না যাস। কিন্তু কানেব মধ্যে বাজত দূর্বাদির কথা—গ্রামে যাও, দেখবে দ্বান্দ্বিক পরিবর্তন হচ্ছে। এস.ডি.ও.-র কথায় সম্বিত ফিরে পায়—চৌধুরীকে চেন নাকি?

—হ্যাঁ স্যার, একদিন গিয়েছিল।

—ভাল লোক, সমাজসেবী। রিপাবলিক ডে'তে একটা মোটা ডোনেশান করেছিল। ও হ্যাঁ, তোমার ঘাট ডাকের নোটিশ কপি পেয়েছি। ভালই করেছ।

সৌকলিন উৎসাহ পায়—তাহলে স্যার, নির্দিষ্ট দিনেই ডাকের কাজটা সেরে ফেলি।

—না, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ওরা ঘাট তো ভালই চালাচ্ছে। পুরুষানুক্রমে ঘাট চালাচ্ছে। বি ট্যাক্টফুল।

—কিন্তু স্যার, অডিট তো ছাড়বে না।

—আরে বাবা আগের বিডিও-রা কি কাজ করেনি, না কি? ঝামেলা হলে ইয়ু উইল বি রেসপনসিবল। ওদের শক্তি তুমি জানো? সৌকলিনের মাথা আর কাজ করছে না। মহাশূণ্যের অন্ধকারে গর্তে যেন তার শরীরটা ঘুরছে ভোঁ ভোঁ করে। শরীরটাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলতে কষ্ট হয়। সত্যিই কি শরীরটা ভারী হয়ে গেল।

ঋত্বিমার জগৎ অতটা জটিল নয়। ইদানিং একটু একটু ভাঙতে শুরু করেছে। কোয়ার্টারে নির্বাসনই তার বড় সমস্যা। ওর সময় কাটে না। শুধু মনের বয়স এক একটা দিন বেড়ে যায়। স্টাফ কোয়ার্টারে অন্য দু'একটা ফ্যামিলি থাকে। চেষ্টাও করেছিল সহজভাবে মেশার। বিডিও-র বউ বলে অন্যরা একটু দূরত্ব রেখে মেলামেশা করে। ফলে জমেনি। সৌকলিনের সারাদিন কাটে অফিসে আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে। কতটুকু সময় আছে ঋত্বিমা'র জন্য বরাদ্দ? রাতটুকুই সব। আর রাত্রির নির্যাস বড়ই সামান্য। হঠাৎ ডিংডং করে ওঠে কলিং বেল—কে আবার এলোরে বাবা?—স্যার, ও স্যার একটু শুনবেন।

—কে?

—মুই আনিমুল হক। বড় বেপদ স্যার। বাংলাদেশী চোরে হালের গরু নিয়া গ্যাছে।

—তা আমি কি করব? বি.এস.এফকে বল।

—ওরা আমাদের কথা শোনে না। আপনি দু'কলম লিখে দিলে গরুটা পাইতেও পারি। বি.এস.এফ. আমাদের মানুষ বলে মনে করে না। যত খাতির বাংলাদেশীদের সাথে। আমরা সীমান্তের জীব। দুই পারের লোকই মারে।

ঋত্বিমা বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। রাত একটা। ঋত্বিমা'র ভাবনার জগতে একটু একটু করে ধাক্কা লাগতে শুরু করেছে। বিয়ের পর সে বলেছিল—জানো যখন শুনলাম—বর আমার ভাবী বিডিও, আমার কি ভয়ই না করেছিল। কেন? কেন কি, একবার বিডিও'র কাছে গিয়েছিলাম রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট আনতে। ভিজিটিং স্লিপ পাঠালাম। ডাক আর পড়ে না। একটা, দু'টো-পৌনে চারটার সময় আর্দালি বলল—যান সাহেব ডাকছে। শুনে আমার ভয়ে বুক ধুকপুক।

—এমা, এমনটি হয় নাকি?

—তুমি তো জান না, ভাবতাম বিডিও কত বড় অফিসার।

—নাগো গিন্নি. বিডিও মানে বড় দুঃখের অফিসার।

—তখন কি অত সব জানতাম ছাই। প্রফেসাররা বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাজার করে—ভাবতেই পারতাম না।

ভাবনাটা আজকাল পেয়ে বসেছে—খালেক মিঁয়া, নিপেন, এস.ডি.ও.-রা কারা। চৌধুরীদের না হয় অন্য একটা গোত্র আছে। পাটনী—খেয়া পারাপারের ব্যবসায়ী। অন্য তিন জনের মধ্যে তো একটা মিল থাকার কথা। জনস্বার্থ। খালেক মিয়া ঘাটের ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছে। কখনও কিছু বললে নিপেনের মুখ থেকে তা আর আলাদা করা যায় না। বয়স্ক ভদ্রলোককে দেখে সৌকলিনের অনেক সময় মায়া হয়। অনেকটা সিঁড়ি ভেঙে শেষ বয়সে সভাপতি। তার দিকে তাকিয়ে আছে পঁচিশটা মুখ। ছেলে মেয়েই সতেরটি। একদিকে পার্টি অন্যদিকে রাজনৈতিক

শরীকি কোন্দল। তাদের দল আঞ্চলিক দল। ইতাসি পঞ্চায়েত সমিতিতে তাদের সদস্য সংখ্যা শরীক দল থেকে বেশী। সংখ্যায় জোরে তারা এখানে দাদা। হাঁটুর বয়সী নিপেনের কথায় খালেক মিঁয়াকে উঠতে বসতে হয়। অন্যরকম হলেই সভাপতির আসন টলে যাবে। অতগুলো মুখের স্বাচ্ছন্দ কি করে হারায়। চোরা স্রোতে তার সৎ ভাবমূর্তি অনেকটা ক্ষয়ে গেছে। ঘাড়ের উপর গরম নিঃশ্বাস ফেলছে পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ সুশীল ডাকুয়া। নিপেনের ডান হাত। আন্দোলন কাকে বলে বুঝিয়ে দিতে পারে। সভাপতি নীরবে সয়ে যায়। আর একটু একটু করে ভাঙে। মাঝে মাঝে মুখ ফস্কে বলে ফেলে—অনেক তো হল বি.ডি.ও. সাহেব। ইচ্ছা হয় সবকিছু ছেড়ে দেব। কিন্তু আমাকে ওরা ছাড়বে না। নিজের রক্তেও লোভ জমেছে অনেক। এতোগুলো পেট যে বড় শত্রু।

বিকাল পাঁচটা। অনেক আগেই চলে গেছে সবাই। তিনটার পর অফিস ফাঁকা হতে থাকে। স্থানীয় কর্মী নেই বললেই চলে। সন্ধ্যা যত বাড়ে সিঙ্গিমারি নদী একটু একটু করে গ্রাস করে নেয় ইতাসি ব্লক। পৃথিবী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন একটা রাজ্য। সেটাকে কাজে লাগায় বাইরের থেকে আসা কর্মচারীরা। ধারে কাছে তখন আর রঘুবীরকেও পাওয়া যায় না। রঘু বি.ডি.ও.-র আর্দালী। এমন সময় নূরন্নাহার এলো। দলের মহিলা শাখার সভানেত্রি। রূপ ছিল এক সময়। এখন একটু ঘষামাজা করতে হয়। অফিসের ক্যাজুয়াল লেবার নিধু বলেছিল—দেখবেন স্যার, নূরুদি আপনার কাছে আসবে। একটু সাবধানে থাকবেন। ওর চরিত্র ভাল না। কাউকে আবার একথা বলবেন না স্যার, তা হলে পার্টি আমাকে তাড়িয়ে দেবে। —তুমি আবার পার্টিও কর নাকি? —কি আর করব স্যার, ওরাই তো আমাকে এখানে ঢুকিয়েছে। নিধু বলতে গেলে বিডিও-র ইনফর্মাল ইনফর্মার। অনেক খবর দেয়, পার্টির কিছু গোপন কথা ও বলে অনেক সময়। সৌকলিনের ধারণা নিধু ডবল ক্রসড। তবু ছেলেটাকে রাতদিন চব্বিশ ঘন্টাই পাওয়া যায়। নূরন্নাহার সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছে। ছোট ছোট চুমকি বসানো। স্বচ্ছ শাড়িতে শরীরের বাড়তি অংশ—সৌকলিন চোখ নামিয়ে নেয়। নূরন্নাহার মুচকি হাসে—স্যারের সময় আছে।

—হ্যাঁ, বলুন।

—আমি নূরন্নাহার খাতুন, ব্লক মহিলা শাখার সভাপতি। এতদিন এলেন, এখনও পরিচয় হল না। আমার আগেই আসা উচিত ছিল।

—আপনার কথা শুনেছি একটু আধটু।

—তাই নাকি! আমার সৌভাগ্য বলুন স্যার—নূরন্নাহার উচ্ছ্বাস দেখায়। আর কথাগুলো মিষ্টি করে বলে।

—আপনি কি কোনো দরকারে এসেছেন?

—না স্যার, সেরকম কিছু নয়। আপনারা কলকাতা থেকে এই অজ পাড়াগাঁয়

এসেছেন। বৌদির সারাদিন একা একা থাকতে নিঃসন্দেহে কষ্ট হয়। আপনার বাসায় যাব একদিন। শুনেছি বৌদি খুব সুন্দরী। আমরা কি অতটা! সৌকলিন টের পায় তার কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্যের তুলনা আছে।

—আচ্ছা আসবেন।

—আর একটা কথা স্যার। ঐ ঘাট দিয়ে আমরা রাতবিরেতে যাতায়াত করি। চৌধুরিদের জন্য আমাদের মান ইজ্জত থাকে। দেখবেন ডাক হলে ঐ যে ডিঙি নৌকার সমবায় আছে না, ওরাও আসবে। ওদের কথা তো এর মধ্যে শুনেছেন—ওগুলো এক একটা লম্পট। ওরা ইজারা পেলে আমরা আর চলাফেরা করতে পারব না। নদীর চরে আমাদের ....।

—তাই নাকি?

নূরন্নাহার উৎসাহ পায়—আপনি স্যার এই গ্রাউন্ডেই তো ডাকটা বাতিল করে দিতে পারেন।

—শুধু এই গ্রাউন্ডেই বাতিল করা যায়? আপনি ঠিক বলছেন?

—আমি তাহলে চৌধুরীদের সাথে কথা বলি। ওরা পুষিয়ে দেবে স্যার। আর আমরা কি খুব খারাপ দেখতে। আগের সাহেবরা...........

—আপনার কথা হয়েছে? আপনি এবার আসুন। সৌকলিনের গলা রূঢ় শোনায়।

—আমি কিন্তু রাগ করিনি স্যার। আশা করি আপনার ভাল আপনি বুঝবেন। নুরন্নাহার চলে যায়। শরীরে তার উগ্রতরঙ্গ।

সৌকলিনের মনে হয় সারা চেম্বার গাঢ় রসে ভরে গেছে। পুরো শরীর কেমন চিটচিট করছে। অসংখ্য আরশোলা যেন চেটে খাচ্ছে রস। সৌকলিনের মনে তখন ভাবনা কতটা জলে ধোয়া যায় ঘৃণা।

মার, মার শালাকে। একটা শোরগোল ক্রমেই বিডিও কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে আসছে। সৌকলিন অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। ঋত্বিমা অন্য ঘর থেকে ডাকল—শিগ্গির এসো। দেখ, একটা লোককে কারা মেরে ফেলল—

—বল কি?

—লোকটা এ দিকেই পালাচ্ছে।

—সৌকলিন ছুটে এলো জানলায়। বিডিও অফিস মাঠে তাড়া করছে গোটা দশেক ছেলে। লোকটা প্রায় তাদের কোয়ার্টারের কাছে ছুটে এসেছে। ছেলেগুলোর হাতে কাঁচা বাঁশের লাঠি, পিছনে দৌড়াচ্ছে দু'জন মেসিন হাতে। কিছু বোঝার আগে খোলা দরজা দিয়ে সে বিডিও কোয়ার্টারে ঢুকে গেল। জন্তুর মতো হাঁফাচ্ছে, মাথা ভিজে গেছে রক্তে। ছেলেগুলো কোয়ার্টারের কাছে কাঁঠালতলায় এসে থেমে গেল—দেখব শালা, তোর কোন বাপ বাঁচায়। ওরা চলে গেল।

—আপনি কে?

-আমি শান্তি বাইন। নেংটিছেঁড়া ঘাট ডিঙ্গি নৌকা সমবায় সমিতির সেক্রেটারি—লোকটা কাতরাতে কাতরাতে বলল।

—দাঁড়ান আপনাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই।

—না স্যার, রক্ত থেমে গেছে। একটু ডেটল হলেই চলবে। আমাকে ডাকে থাকতে হবে। ঋত্বিমা ডেটল আনতে গিয়ে ভেঙেই ফেলল শিশি। চোখে মুখে আতঙ্ক।

—ওরা আপনাকে মারতে গিয়েছিল কেন?

—স্যার, ওরা বুঝে গেছে, এবার ঘাটের ডাক হবেই। আর ডাক হলেই ওদের বিপদ। আমরা ডাকে অংশ নেব—ওটাই ওদের ভয়।

—থাক, আপনি চুপ করে থাকুন, পুলিশকে খবর দিই।

—স্যার, তেমন লাগেনি। আমরা জলের পোকা। অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারি। ওরা আমাদের মাঠে মারে, পাতে মারে। মেরেই ফেলতে চেয়েছিল। বহুবার ভেবেছি আপনার কাছে আসব একবার। চৌধুরীদের লোক চোখে চোখে রেখেছে।

—আপনাকে মেরে চৌধুরীদের লাভ কি?

—লাভ অনেক স্যার, প্রচুর তামাক হয় ইতাসি ব্লকে। মহাজনদের আড়ৎ নদীর ওপারে মহকুমা সদরে। দেখছেন তো সারাদিন তামাক ভর্তি সারি সারি ট্রলি দাঁড়িয়ে থাকে ঘাটে। ওপারে যায়। ট্রলি, যাত্রী পারাপারে দিনে আয় প্রায় দশ হাজার টাকা। বছরে ত্রিশ লক্ষের বেশী। বছরে ওরা পঞ্চায়েত সমিতিকে দেয় মাত্র তেইশ হাজার টাকা।

—ডিঙি নৌকা চালিয়ে আপনারা ভালই তো পান।

—আমাদের কথা আর বলব কি স্যার। নদী যখন গজরায় তখন আমরা নদীতে কাজ করি। গোটা নৌকায় পার হতে লাগে দেড়, দুই ঘণ্টা। সময় বাঁচাতে লোক ডিঙি নৌকায় ওঠে। ঘাট ওদের বলে ওরা নেয় তিন ভাগ, আমরা পাই মাত্র এক ভাগ। বৈঠা হাতে আমরা টের পাই মা গোশানী ডাকছে আয় আয়। কত মাঝি চলে গেল সিঙ্গিমারিতে। তাদের ছেলেপান আবার মরার জন্য বৈঠা ধরে। পেটের দায় এমনই।

—কিন্তু আপনারা বড় নৌকা কোথায় পাবেন?

—স্যার, সমবায়ের কিছু টাকা আছে। আপনার কো-অপারেটিভ ইন্‌সপেক্টর ভৌমিকবাবু জানেন। ঐ টাকা দিয়ে আপাতত নৌকা ভাড়া নেব।

—এভাবে হয় নাকি? শুনেছি একবার আপনার ঘাট নিয়ে চালাতে পারেননি।

—ওসব ওরা বলে স্যার। আপনার আশেপাশে সবাই চৌধুরীদের লোক। পুরানো দু'একজন কর্মী আছে আপনার অফিসে, তারা জানে স্যার। কিন্তু ভয়ে মুখ খোলে না। সেবার আপনার মতো বিডিও সাহেব এসেছিলেন বাসুদেব সান্যাল।

সাহেবের জেদাজেদিতে ঘাটের ডাক হল। আমরা ডাক পেলাম। আগে ওরা ঘাট নিত জলের দরে। এক দেড় হাজার টাকায়। আমরা নিয়েছিলাম একুশ হাজার টাকায়। পনের বছর আগের কথা। এখন চৌধুরীরা দেয় মাত্র তেইশ হাজার টাকা। বছরে দু'একশ করে বাড়ায়। ওদের মর্জি মতো। আগের কথায় আসি স্যার, সমবায়ের পঁচিশজন মেম্বার জমিজমা বিক্রি করে নৌকা গড়েছিলাম। সান্যাল সাহেব আমাদের একটা লোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। প্রথম তিন মাসেই আমাদের অবস্থা একটু একটু করে ফিরছিল। আমাদের সেকি উদ্যম। সকাল বিকাল নৌকা টানি। আমাদের নৌকা, লাভ লোকসান আমাদেরই। সেদিন অমাবস্যার রাত, ডিউটি ছিল চারজনের। পরদিন দেখা গেল নৌকাগুলো কারা কুড়োল দিয়ে ফালি ফালি করে দিয়েছে। অনেক পরে ওদের লাশ মিলেছিল বালির নীচে। তিনজন ছিল রাজবংশী, একজন ভাটিয়া। আমাদের জীবন সবাই নেয়। মানুষ আর মা সিঙ্গিমারি।

পুলিশ এলো ঘণ্টা খানিক পরে। বাইরে চাপা উত্তেজনা। পঞ্চায়েত সমিতি হলে ঘাট ডাকের জমায়েত। ধোপ দুরস্ত চৌধুরীরা চার ভাই। শান্তি বাইন বসে আছে সামনের সারিতে। বিডিওর কাছাকাছি। জড়োসড়ো অবস্থা। পিছনে মাঝি মল্লাদের মাঝে কয়েকজোড়া শক্ত চোখ। সৌকলিন ঘাট ডাক ঘোষণা করল—এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। অমর চৌধুরী বলে উঠলো, সাব বলেন কি? পাটনী মানুষ এত টাকা কোথা থেকে দেব? বংশীলাল তাকে থামিয়ে দেয়। পঞ্চায়েত সমিতির ক্লার্ক বনিকবাবু ডাকছেন—এক লক্ষ পচাঁত্তর হাজার—এক, দুই......। আরে ধোরেন, ধোরেন সোভাপতি সাব অজ্ঞান হইয়া গেল। সৌকলিন কিছু বোঝার আগেই চৌধুরীরা সভাপতিকে ঘাড়কোলা করে মারুতিতে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক সেদিনের মতো বন্ধ।

মিছিল একটি শব্দের কোলাহল। এমনি তার মনে হয় বরাবর। ছাত্রাবস্থায় অনেক মিছিলে সে গেছে। মিছিলের শেষ কোথায়, প্রাপ্তি কি, এলোমেলো প্রশ্নগুলো তার মাথায় আসেনি তা নয়। তবু মনে হত কোলাহল ভেঙে মিছিল একটা সুর হবে। কিন্তু পুষ্করদা যে তুখোড় বক্তা, অর্থনীতির ভাল ছাত্র সবাই তার সাথে সমান তালে এগুতে পারবে? সব কথায় উত্তর তার জানা ছিল না। তবে একটা সহজ সরল সমাধান হত আপনা আপনি। ছোটবেলা থেকে সৌকলিন নিজেদের সংসার দেখেছে। সংসার তো নয় দু'পায়ে খুঁড়িয়ে চলা। অন্তত রাষ্ট্রের কাছে কাজের বিনিময়ে দু'বেলা ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের নিশ্চয়তা পেলে মন্দ কি। সেই মিছিল যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে সৌকলিন হাড়ে হাড়ে বুঝল। এখন মিছিল আসে তার উদ্দেশ্যেই। সে বিডিও, তার কাছে নাকি আছে সকল যন্ত্রনার উপসম মলম। ডাক বন্ধের তৃতীয় দিনে নিপেনের নেতৃত্বে মিছিল—অপদার্থ বিডিও দূর হটো, দূর হটো। ধনীকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী দালাল বিডিও নিপাত যাক—নিপাত যাক। বাইরে

মাইক লাগিয়ে সমাবেশে বক্তব্য রাখছে নিপেন বর্মন। ডেপুটেশন দিতে বিডিওর চেম্বারে সুশীল ডাকুয়াসহ জনা পঁচিশেক লোক—বিডিও সাহেব গরীব মানুষের জমির ধান মাজরা পোকায় কেটে দিচ্ছে, আপনি কি ব্যবস্থা করলেন? বাইরে নিপেণ বর্মনের গগনভেদী গলা—জোতদারদের জমি দখল নেব ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য আর বিডিও সেটা বানচাল করে দেবে তা আমরা কিছুতেই হতে দেব না। একাধিক বার আমাদের ভূমি সংস্কারের কাজে বাধা দিয়েছে। সৌকলিনের ইচ্ছা হয় চিৎকার করে বলে—দুর্বাদি দেখে যাও, গ্রামে কি দ্বান্দ্বিক পরিবর্তন হচ্ছে। তুমি তো জানো না এদের ভাঙা গড়ার কাহিনী। কিছুদিন আগে বকুর মিঁয়ার জমিতে ফ্লাগ পুঁতে দিয়েছিল সোহান আলি। বকুর মিঁয়ার পাঁচ শতকই হাল জমি। পার্টির নির্দেশ, ও জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। বকুর জোতদার পক্ষের লোক। বকুর সৌকলিনের পা ধরে কেঁদেছিল—স্যার, আপনি আল্লার ফেরেস্তা— মোর ঐ জমিটুকুই সম্বল। মোর অপরাধ নরেশ মাস্টারের সাথে অন্যদলেব মিছিলে গেছিলাম। সোহান আলির কথা মতো ওদের দলের লোকদের আমার জমিতে চল্লিশ টাকা রোজে মুনিস খাটাই নাই। প্রথমে ওরা বয়কট করল, এখন গেল জমিটা। সৌকলিন পুলিশ পাঠিয়ে বকুর মিঁয়ার জমি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। দু'একটা এ ধরনের ব্যাপারে পুলিশ যেত। এখন আর যায় না, এড়িয়ে চলে। পুলিশের সাধারণে প্রশাসনের কথা শোনার তাগিদই নেই। লাঠি যার ক্ষমতা তার। জেলা শাসকের কথাই মানে না এস.পি.। জেলাশাসক-এর আর এস.পি.'র এ.সি. আর দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বিডিও তো কোন ছার। নিপেনবাবু সরাসরি চার্জ করেছিল—আপনি জোতদারদের দালাল। সরকারী নীতির বিরোধিতা করছেন। —দেখুন নিপেনবাবু, সরকারী নীতিকে রূপায়িত করাই আমার কাজ। আমার ব্যক্তিগত কোনো মতামত নেই। বিগ রায়তের সিলিং বহির্ভূত জমি ধরুন। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করব। নিপেন বর্মন ব্যঙ্গসূচক হেঁসেছিল। পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ চেম্বারে এক একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে সৌকলিনকে-- খরায় আমাদের চাষী ভাইরা জমিতে সেচ দিতে পারছে না, নদীর জল চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে। আপনি কি ব্যবস্থা নিলেন? বিডিও বলার চেষ্টা করে এটা একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার, আপনাদের কথা আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। আপনি যদি কিছু না করতে পারেন তবে আছেন কেন? মাইকের আওয়াজ আরো জোরাল হয়—আমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে বলেছিলাম চৌধুরীদের অভিজ্ঞতার কথা। বহু পুরুষ ধরে ঘাট চালাচ্ছে ন্যায্য দামে। জান মালের সুরক্ষার কথা। যা চৌধুরীদের ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। অথচ বিডিও দালালি করল। মোটা টাকার বিনিময়ে। সভাপতিকে মেন্টাল টর্চার করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সভায় আওয়াজ উঠল —বিডিওর কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। ভেঙে..........।

চেম্বার থেকে দেখা যায় বিডিও কোয়ার্টার। মাঝখানে মাঠ ভর্তি লোক। জানলার পর্দা সরিয়ে ঋত্বিমা তাকিয়ে আছে। তার রাত কাটে দুঃস্বপ্নের মতো, দিন কাটে আতঙ্কে। সৌকলিনকে প্রায়ই বলে—ফিরে চলো, টিউশন করে খাবো। সৌকলিনের সাহস হয় না। আবার সেই অভাবের গুহায় ফিরে যাবে? নেই-চাই-এর জাঁতাকলে পড়বে। না ফাঁদে আরো জড়িয়ে যাবে। অথচ সমাধান কত সহজ। তবু মনের সায় পায় না। ঋত্বিমা আগের দেখা বিডিও-র ছবিটা ভুলতে চায়। কান্না তো কম হল না।

সাত দিনের মাথায় দু'টো চিঠি কোয়েনসাইড করল। একজন অচেনা লোক হাতে হাতে নিয়ে এসেছিল সৌকলিনের বদলির চিঠি। বংশীলাল দিয়ে গেল মহামান্য হাইকোর্টের স্টাটাস্কো অর্থাৎ স্থিতাবস্থা জারির আদেশ। একতরফা রায়। বিডিও তিন নম্বর বিবাদী। চিঠিটা হাতে দিয়ে চৌধুরী বলেছিল—বিডিও সাব, তা হলে লোক পাঠিয়ে আগের মতো তেইশ হাজার টাকাই ইজারা বাবদ জমা দিয়ে যাই। সৌকলিনের কি-ই বা বলার আছে। সব যেন গীতার কথা। ভবিতব্য।

নেংটিছেঁড়া ঘাটের এ পারে দাঁড়িয়ে রইল নাইনটিন সিক্সটি টু-র বাঁ হাতি উইলিজ। নদীটা ভরে গেছে পাহাড়ী জলে। ওপারে ফিরে যাওয়ার বাস। নসিরামের ডিঙিতে সৌকলিন আর ঋত্বিমা। পালে হাওয়া লেগেছে ভালই। ঋত্বিমা হাঁটুতে চিবুক ঠেস দিয়ে বসেছিল। —এই ঋত্বি, সৌকলিন কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেয় তার। —কি? মাথা তুলে দেখ পিছন দিকে। ঋত্বিমা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ঘাটের সব ছোট নৌকা পাল তুলে অর্ধচক্রাকারে এগিয়ে আসছে তাদের নৌকার পিছনে পিছনে। যেন এক ঝাঁক সাদা বকের ডানা ছুঁয়ে আছে নীল সাদা আকাশ। কোনো নৌকায় যাত্রী নেই। সত্যি! ঋত্বিমার মুখে হাসির ঝলক। হ দিদিভাই, মোরা আইজ আর নাও বাইমু না—নাসিরামের চোখ ছলছল করে উঠে।

নগেন কাকুর চিঠি

স্নেহের নিম্‌কি,

কবে থেকে বলছিলাম ঠিক মনে নেই। মনে থাকারও কথা নয়। মানুষ যে দেশে জন্মায় সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বিশ্বগ্রামের সব মানুষ এখন জন্ম ভিটায় মরে না। তবু বেশীর ভাগ মানুষের কবর কিংবা সমাধিতে দেশের দুর্বাঘাস জন্মায়। বুনো গুল্ম লতাপাতা আচ্ছন্ন করে রাখে। ঝিঁঝি পোকারা সারারাত এক নাগারে গেয়ে চলে পূর্ব পুরুষের গান। আমিও চেয়েছিলাম পূর্বপুরুষের পাশে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে। কিন্তু যুক্তির ভিতর থেকে উঠে আসা যুক্তিতে ও ভয়ের পরিবেশে আমার অনুভূতি এঁটে উঠতে পারছিল না। ভিতরে বাইরে চলে যাওয়ার চাপ তৈরী হচ্ছিল দীর্ঘ দিন ধরে। আর আমাকে কলের গানের মতে আওড়ে যেতে হচ্ছিল স্বদেশে মরার কথা। বাপ দাদার সমাধির পাশে শুয়ে থাকার কথা। বয়স বাড়ছিল, বুঝতে পারছিলাম চিমটি কাটলে ব্যাথার অনুভূতি হয়। শেষে বাঁধ ভেঙে গেল, নিদেন পক্ষে আল ভাঙলে অরুনির মতো শুয়ে জল আটকাতাম। যে রাতে পালিয়ে এলাম ইন্ডিয়ায় সে রাতের কথা তোমার জানবার কথা নয়। তোমার খালেদ চাচাকে মনে আছে? চুল দাড়ি পেকে সাদা, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আলখাল্লা। বড় ধর্ম প্রাণ মানুষ। বড়দিয়া থেকে প্রথম হজে গিয়েছিল কিন্তু কি বলব আমার মেয়ে, হাজি খালেদ চাচা কোনোদিন মসজিদে যেত না। মসজিদের চৌহাদ্দি এড়িয়ে চলত। মতোয়ালি তাকে বলত হাজি পাজি। গ্রামের কত ছেলে যে তার পয়সায় পড়েছে। অলগির সত্যেন থাকত জগন্নাথ হোস্টেলে আর খরচ যোগাত খালেদ চাচা। খালেদ চাচা আমার ডিস্‌পেনসারিতে বসে থাকত। বলত—মক্কার শয়তান মারার পাথরগুলো যদি নিয়ে আসতে পারতাম। শয়তান মারার পাথর না আনতে পারার জন্য চাচার আফসোসের অন্ত ছিল না। হাজি চাচা বোধ হয় কালিকা পুরাণের গল্প জানত না। শয়তানরা রক্তবীজের বংশধর। প্রতিফোঁটা রক্তয় জন্ম নেয় শতশত অসুর। চাচা কত পাথর আর আনতে পারত? কেমন করে জানি না, হাজি চাচা বুঝতে পেরেছিল আমরা পালাব সেই রাতে। সবার শেষে আমি নায়ে উঠতে যাচ্ছি। হাতে এক মুঠো ভিটার মাটি, পিছন থেকে কে একজন আমাকে জাপটে ধরল। অন্ধকারে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হাতের মাটিটুকু কেড়ে নেবে নাকি? পরে বুঝলাম হাজি চাচা। চোখের জলে হাজি চাচাব

দাড়ি আর আলখাল্লা ভিজে বুক ভেসে যাচ্ছে। শেষে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শিশুর মতো কেঁদে উঠেছিল। মুখে একটাও কথা বলতে পারল না।

আমাদের নৌকা অলগি থেকে ভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ খানিকটা উঁকি দিচ্ছে পশ্চিম আকাশে। কার্তিক মাসের নিশির পড়া নিঝুম গাছপালা। ছই-র মধ্যে নির্মল, গোপাল, সুনীতি, তোমার কাকিমারা মিলে সাতটা প্রাণী মূর্তির মতো ঝিম মেরে বসে আছে। আমি আর চিত্রালি ছই-এর বাইরে। চিত্রালির আর কত বয়স হবে সাত আট। হঠাৎ খেয়াল হল আমাদের বাড়ির কুকুর ভুলু খালের পার দিয়ে নৌকার সাথে সাথে হাঁটছে। ভুলু বাবুদের ডাল কুকুর নয়। বাড়ির ফ্যান বাসি ভাত খাওয়া কুকুর। যে দেশের মানুষের চোখে আমরা মালাউন, বেধর্মী, অপাঙক্তেয়, সেখানের একটা ছোট্ট প্রাণীর প্রাণে এত দয়া? ভুলু মাঝে মাঝে হা-উ-উ করে চিৎকার করে কেঁদে উঠছিল। চিত্রালি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না, হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। চিত্রালি কি করে জানবে গোটা জন্মভূমিটাই ছেড়ে চলে যাচ্ছে পরবাসে। আর সেখানে আঁধারের মতো জমাট বেঁধে আছে কান্না। যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও আমি দ্বৈরথ লড়িনি। কিন্তু আমার ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম আমার মধ্যে পিতৃত্বের সাথে লড়াই করে। তারাও জাহাঙ্গির, কামালদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে হানাদারদের বিরুদ্ধে। দেশের জন্য তারা মুসলমানভাইদের মতো গিয়েছিল রক্ত দিতে। জীবনে একটাও তির না ছুঁড়ে আমি শরশয্যায় শায়িত ভীস্ম। নিজের চোখে দেখছি ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে ইন্ডিয়ার রেলবস্তিতে। আমি ছাড়া এই অনুপ্রবেশকারীর রক্ত কেউ দেখতে পায় না। আপন-পর, অস্তিত্ব-অস্তিত্বহীনতা আমি শরশয্যায় শুয়ে আগুনে ঝলসে নিই প্রতিদিন।

বকুলগাছ, ধবলি গাই, মিষ্টি মেয়ে নিম্‌কি আর রাঙা বৌদিকে রেখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে ছিলাম রাতের অন্ধকারে। তেমন এক রাতের অন্ধকারে কাঁটাতারের ফুটো দিয়ে ঢুকেছিলাম হিন্দুস্থানে। হিন্দুদের দেশ! আঃ কি আনন্দ! প্রতিদিন কুড়ে খাবে না নিরাপত্তাহীনতা। পাটক্ষেতে নীল হবে না মেয়েদের শরীর, অন্ধকারে ধুতির কোচা ধরে টান মেরে কেউ বলবে না—ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পিন্দো। শামুকের খোলের মধ্যে আর লুকিয়ে থাকতে হবে না, আমার ছেলেকে রাস্তা ঘাটে নিজের পরিচয় কামাল হিসাবে দিতে হবে না। কমল এখন শুধু কমল। গোপালকে আর কোন দিন ইন্টারভিউ বোর্ড প্রশ্ন করবেনা—এক জন হিন্দুর হাঁটা পথে ইন্ডিয়া যেতে কত দিন সময় লাগে। ফেলে আসা দেশ, জন্ম ভিটার জন্য যতই কষ্ট হোক ভিতরে ভিতরে নিরাপত্তা বোধের, মুক্তির খানিকটা আনন্দ প্রায় সবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাচ্চাগুলোর মুখে তিন দিন প্রায় কিছুই জোটেনি। তুমি ভাবতে পারবে না, তারা ও যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। বর্ডার

থেকে তিন কিলোমিটার হেঁটে একটা গঞ্জমতো জায়গায় যখন পৌঁছালাম তখন আমার ঘড়িতে সকাল সাতটা। পরে বুঝেছিলাম আসলে তখন ইন্ডিয়ার ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা। সারা জীবন সময়ের ব্যবধান ঘটে গেল ফরিদপুরে জন্মানোর জন্য। আমার ঔরসে যারা জন্মেছে তাদের তো খেশারত দিতেই হবে। সেই ছোট গঞ্জ থেকে বাসে করে যেতে হবে বনগাঁও। বাসে উঠতে যাচ্ছি তখন পুলিশ ফাঁড়ি থেকে দু'জন পুলিশ যমদূতের মতো এসে বাসের দরজা আগলে দাঁড়ালো—বাড়ি কোথায়? নিম্‌কি তুমি যদি দেখতে তখন আমাদের। সবার মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর, তাড়াখাওয়া জন্তুর মতো। সত্যিই তো বাংলাদেশী হিন্দুদের বাড়ি কোথায়? তিন দিন ওরা আমাদের আটকে রেখেছিল আট বাই নয় ফুট একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে। মানুষের প্রাণ কই মাছের মতো। না হলে তো ঐ ছোট্ট ঘরে আমার বাঁচার কথা নয়। আমার মনে হতো কি জানো—হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আছি। ছোট্ট পুলিশ ফাঁড়ির মালখানায় হয়ত ন'টা লোক মারার গুলি নেই। শহরে লোক পাঠিয়েছে গ্যাস আনার জন্য। চিত্রালি অ্যানির ডাইরির মতো একপাতাও লিখতে পারবে আমার মানে হয়নি। গিয়াসউদ্দিন মোল্লা ছিল আমাদের গ্রামের প্রথম কমিউনিষ্ট। গোপনে গোপনে গিয়াস চাচা অনেক বই দিত আমাদের পড়তে। সে-ই দিয়েছিল অ্যানির ডায়রি। ছোট্ট অ্যানির রক্তহীনতা, খুন হয়ে যাওয়া মানুষের বিবরণ। তবু অ্যানি ভাবত একদিন সূর্যের ভোর আসবেই। ভয়ে চিত্রালি সারাক্ষণ মায়ের কোলের মধ্যে কুকুর কুন্ডলী পাকিয়ে ছিল। আমার যখন শ্বাস নিতে কষ্ট হত, তোমাদের ফাঁকা উঠোনের কথা মনে হত। রাঙা বৌদির করা গরম চা আর দক্ষিণা হাওয়ায় কি যে একটা সুখানুভূতি কাজ করে যেত! ওরা আমাদের কোর্টে চালান করল না। কার মনে দয়া মায়া লুকিয়ে ছিল কে জানে। আমাদের কাছে যা সামান্য কিছু ছিল একজন পুলিশ সব কিছু কেড়ে নিয়ে বনগাঁও-র দিকে ফাস্ট বাসে তুলে দিল। তারপর অনেক ইতিহাস। কি লাভ সে সব বলে। সংক্ষিপ্ত করি এভাবে, খোলা আকাশ, রেল স্টেশন থেকে তাড়া খেতে খেতে আমাদের রেল লাইনের ধারে বস্তিতে ঠাঁই মিলেছে। সারা রাত দিন মৃত্যুর চাকা ঘোরে আমাদের শিয়রে।

তুমি পাখির ডানায় ভর করে উড়ে যাও সাগর পারের দেশে। জানি স্মৃতি যখন উসকে দেয় শৈশব, তোমার ইচ্ছে হয় নগেন কাকুর কাছে নালিশ জানাতে। ইচ্ছা হয় বলতে, "কাকু, রাক্ষসগুলোর নখ বেড়ে গেছে. জিভ থেকে আগুনের লাভার মতো লালা ঝরে।" নালিশ আর জানাবে না হয়ত কোনো দিনও। বয়স তোমাকে বুঝতে শিখিয়েছে গ্রীক মহাকাব্যের কোন নায়কই আমি নই। আমি তোমার এক অসহায় বৃদ্ধ কাকু। ঢাকা থেকে একবার উড়ে এসো না, দেখবে আমি কেমন আছি। রেল লাইনের দু'ধারে জবর দখল করে আমার সারি সারি টালির ঘর

বানিয়েছি। ঘাড়ের কাছে প্রতিনিয়ত অনুহ্যভাবে উচ্চারিত হয় উচ্ছেদের কথা। বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষজনই প্রায় সব। ফলে উচ্ছেদ শব্দটা আর তেমন বিচলিত করে না। সবার শিকড় কবেই উপরে গেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমার এই রেল বস্তিতে দমবন্ধ হয়ে আসে এখনও। হাঁসফাঁস অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য সন্ধ্যার পর রেল ওভার ব্রিজের উপর গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। ফুরফুরে হাওয়া আসে অনেক দূর থেকে। সন্ধিহীন লাইন দু'টো শেষ হয়ে গেছে বোধ হয় বর্ডারে। রেল লাইনকে বরাবরই নিষ্ঠুর প্রকৃতির মনে হয়। জড় হলেও ওরা মিলতে পারে না, মিলাতে পারে না সময়। এপার ওপার। মাঝে মাঝে কেটে দিয়ে যায় শরীর। হাওয়া কি আসে বর্ডার থেকে? তন্দ্রা এসে যায়। একদিন রেল ব্রিজে বসে আছি, মাইকে বেজে চলছে জীবনানন্দের কবিতা। মৃত্যুর পরে জীবনানন্দের কদর বেড়েছে। ধান সিঁড়ি, জারুল, শিরিষ আর চাল ধোয়া মিঠে হাত খান। চোখের সামনে জ্যোৎস্নামাখা অলগি, বড়দিয়া, রাঙা বৌদির মিঠে হাত। তোমার মা'র সাথে আমার সম্পর্কের গভীরতা খুঁজতে চাও তুমি? আমি কি ছাই জানতাম কেন তোমার মায়ের হাতে সাধারণ চায়ে এতো খুশবু, পানপাতা এতো মিঠা। সবার অলক্ষ্যে ফিরোজার নরম হাত ছুঁয়ে যেত আমার হাতে চা আর পান দেওয়ার অছিলায়। সুরগুলো যে কোথায় থাকত কে জানে। শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সঞ্চারিত হত মেঘমল্লার। জানতাম, সেদিন যাকে ঔষধ দেব তার দেহেও প্রবাহিত হবে সুর। সুর থাকলে অসুখ থাকতে পারে? তোমার আব্বার সামনে তোমার মাকে রাঙা বৌদি বলে ডাকতাম। মনে মনে একটা নাম দিয়েছিলাম, ফিরোজা। না থাক, আগে বলি হিজল গাছের কথা।

দ্বিতীয়বার আমাদের বাড়ি পোড়ানো চোখের সামনে দেখেছি। রাজাকার আর ইয়াহিয়ায় ঘাতক বাহিনী প্রায় চুপিসারে হানা দিয়েছিল। আমরা যে যেদিকে পারি ছুটে পালিয়েছিলাম। আমি বেশী দূর যেতে পারিনি। বাড়ির উত্তরপাশের ডোবাটা কি আছে এখনও? আমরা বলতাম ব্যার। সেই ব্যারের গলা জলে কচুরি পানার মধ্যে নাক উঁচু করে লুকিয়ে ছিলাম। প্রাণের অদ্ভুত মায়া। প্রথম সুযোগ সবাই চায় নিজেকে বাঁচাতে। তারপর সম্পর্কগুলো ঘুরে ঘুরে আসে। কাছের মানুষগুলোর মুখ ভেসে ওঠে। যখন ভাবছি কেউ রয়ে গেল কি না তখনই চিৎকার ভেসে এলো— "ও বাবাগো, জলিল কাকা ধরে নিয়ে গেল।" আমার প্রাণের বন্ধু জলিল। আমাদের বাড়ি একবেলা না এলে যার ভাত হজম হত না। কচুরি পানার ফাঁক থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম জলিলের মুখে খাবলা খাবলা উঠে যাচ্ছে মেয়ের স্তন নাভি। তাই দেখে ইয়াহিয়ার খুনে বাহিনী পৈশাচিক নৃত্য করছে। বড়দিয়ায় সেদিন রাতের অন্ধকারে গেছিলাম জলিলের কাছে চম্পাকে ফিরিয়ে আনতে। জলিল

আমাকে দেখে রামদা নিয়ে তেড়ে এলো—হালা মালাউনের বাচ্চা, ভাগ এহান থাইক্যা। তবু আমি জলিলের দু'পা জড়িয়ে ধরেছিলাম। জলিল শত হলেও আমার বাল্যবন্ধু। বলল—তোরা হিন্দুরা তো মোসলমানের আইঁটা করা মাল নেস না। জলিলের পায়ের উপর আমার মাথা চেপে ধরে বলেছিলাম—আমার চম্পাকে ফিরিয়ে দাও। এই প্রথম জলিলকে তুই থেকে তুমি বললাম। পরে যখন রাষ্ট্র জলিলকে বড় নেতা বানালো তখন আপনিই বলতাম। জলিলের প্রাণে তখন মায়া হয়েছিল, আমাকে মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সদ্য দেওয়া একটা কবর দেখিয়ে বলল—এই খানে আছে তোর মাইয়া নিয়া যা হালা। স্তুপাকৃতি মাটির ডেলার পাশে চম্পার ডুরে শাড়ি আর রক্তমাখা ছিঁড়ে ফালা ফালা করা সায়া। না, আমি শুনতে চাইনা জীবনানন্দ দাশ আপনার কবিতা আর। কেন রেখেছেন আপনার কবিতায় এতো নিঃশব্দ হিজলের কথা! নিম্‌কি তুমি ভুল দেখনি। প্রতিরাতে হিজল গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আমার চম্পা। দেশ ছেড়ে পালানোর সময় চাক্ষুস দেখলাম হিজল গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চম্পা। বলল—এবারও আমাকে একা ফেলে পালিয়ে যাচ্ছ বাবা!

তুমি যদি ভগবানকে চিঠি লেখ হলফ করে বলা যেতে পারে পৌঁছাবে না। কারণ তার ঠিকানা নেই। তবু অস্তিত্ব অনস্তিত্বের দ্বন্দ্বে সৌরমন্ডলে ঘুরবে হয়ত অনন্তকাল। আমার কাছে তোমার চিঠি পৌঁছানোর কথা নয়। কারণটা স্বাভাবিক —আমাদের কোনো ঠিকানা নেই এবং যথারীতি শিকড়হীন, তবু আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। কথায় বলে না—প্রাণের টান। রাঙাবৌদি ফিরোজার মেয়ের চিঠি। দিনটা পুজোর পরে কোন এক সময়। বিকালে এক ঢোঙা মুড়ি আনা হয়েছিল। সবাই মিলে ভাগ করে খাব। মুড়ি এলেই ভাবনা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমাদের দোতলা কাঠের বাড়িতে আপারে মটকা ভরা মুড়ি থাকত। সারা বছরের জন্য। মুখে সরা, তার উপর সাদা কাপড় দিয়ে বাঁধা। ইচ্ছে হলেই ছোট বেতের ধামায় মুড়ি নিয়ে এসে নারকেল আর গুড় দিয়ে প্রয়োজনের থেকেও প্রায়ই বেশী খেয়ে ফেলতাম। তারপর পেয়ারী বাইনের বড় ভিটায় লম্বা দমে দৌড়। ব্যাস, আবার ফিরে আসত রাক্ষুসে ক্ষিদে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—মুড়ির ঢোঙা ঝাপসা চোখে পড়ি মাঝে মাঝে। এখন আর ঘরে পেপার আসে না, বাড়ির শিশুরা সন্দেশ পত্রিকার নামই শোনেনি। মনে পড়ে না প্রমথেশ বড়ুয়ার কথা এপারে এসে একবারও ভেবেছি কিনা। কি হল সেদিন ছেঁড়া ঢোঙাটা পড়তে গিয়ে চোখ আটকে গেল নিজের নামটা দেখে। তারপর সেই ফরিদপুর, ভাঙ্গা, বড়দিয়া, অলগি, রব মুন্সির গরুর বাথান। যেখানে আমাদের বাড়ি ছিল। আমার ডিসপেনসারী ছিল। ঔষধগুলোর নাম ভুলে গেছি সেই কবে। তাই আলাদা করে আর বলা কি দরকার আছে যে আমি পৃথিবীর কোনো রোগ আর সারাতে পারব না।

কিছু দিন কলেজ স্ট্রীটে গোপেশ দাসের বাড়ি যেতাম ছেলে পড়াতে। নীচের ক্লাশ, যা পেতাম ছেলেদের হাতে তুলে দিতাম। ওদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। যাতায়াতের পথে কত হকারের সাথেই তো দেখা হয়। তারা সবাই হারিয়ে যাওয়া মানুষ বা বলতে পার তাদের বংশধর। রোজ কত কথা বলে তারা। সবার উদ্দেশ্য ক্রেতাকে আনন্দ দেওয়া, পুষ্টি দেওয়া অথবা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা। তেমনই একদিন একটি লোক কি চমৎকার ভেষজের গুণাবলী বুঝাচ্ছিল। বলছিল প্রাচীন কালের ধন্বন্তরীদের কথা। স্বরটা এত চেনা। অথচ চেহারা মিলছে না। ভাঙ্গাচোরা চোয়াল, চুল হাল্কা হয়ে গেছে। বয়সের তুলনায় ন্যুব্জ। ইচ্ছে হল কাছে গিয়ে দেখি। আরে এযে আমাদের অমু। এই সেই কান্তিময় অমিত? যাকে তুমি রাম বলে ভাবতে। যে হরধনু ভেঙেছিল। অমিত এখন একজন বামপন্থী হকার। মার্কস, লেলিনের কথা আর বলে না। অমু কোনো স্বপ্নই দেখে না। দিন বদলের স্বপ্ন তো নয়ই। অমু থাকে রেল হকার ইউনিয়নের কোন এক দাদার ছত্র ছায়ায়। তার পছন্দ অপছন্দ অমু ঠোঁটের ডগায় ঝুলিয়ে রাখে, দাদাকে চটালে রেল লাইনে হকারির পাঠ ঘুচবে। অমু অবশ্য নিজের ভাগ্য ফেরানোর একটা চেষ্টা করেছিল। বয়স ভারিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লুকিয়ে ভর্তি হয়েছিল নাইনে। হকারির পাশাপাশি পড়াশুনা করে আবার একটা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিয়েছিল। অমুর মেধার গল্প আমাদের গ্রামের কে না জানত। অমু লাখো বেকারের লাইন টপকে চাকুরির পরীক্ষায় প্রথমদিকে চলে এসেছিল। সোনারপুরে ওরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকে সেখানে পুলিশ এসেছিল ভেরিফিকেশন করতে। পুলিশ বোধ হয় জেনেই এসেছিল সব। প্রথম প্রশ্ন, জন্ম কোথায়? নাগরিকত্ব আছে? পুলিশ অফিসারের ছকে বাঁধা সহজ সরল প্রশ্ন। সে কি করে জানবে স্বাধীন বাংলাদেশের হিন্দুরা হারিয়ে গেলে জন্মস্থানও থাকে না, নাগরিকত্বও থাকে না। বুঝতেই পারছ অমু স্থায়ী হকার হয়ে গেল। একদিন গিয়েছিলাম অমুদের সোনারপুরে ভাড়া বাড়িতে। বাঁশের দরমা বেড়া দেওয়া দুটো ঘর। স্যাঁতস্যাঁতে। অমু বিয়ে করেনি। আর করবে বলেতো মনে হল না। ফিরে আসার সময় অমু আকাশের দিকে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা কাকু, ওরা কি আমাদের গোলাপজাম গাছটা কেটে ফেলেছে। বয়সের ভারে আমার স্মৃতিশক্তি যে মাঝে মাঝে শূন্য হয়ে যায়, তা পরে বুঝেছি। পরে মনে হল তোমাকে অমু গোলাপজাম বলে ডাকত। ক্লান্তিতে যখন স্বেদগ্রন্থি থেকে নেমে আসে বর্ষার মতো নোনতা ঘাম, হয়ত অমু তখনও গোলাপজামের আঁটির ভেঁপু শুনতে চায়।

অলগি গ্রামের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বিশ্বেশ্বর দাস। বিশ্বেশ্বরের ছেলে গোপেশ। শহরের সাথে যোগাযোগ ওদের কয়েক পুরুষের। ফলে দেশের হালহকিকত ওরা ভাল বুঝত। দেশভাগের সময় অলগির ভবিষ্যৎ ওরাই বোধ হয় প্রথম বুঝতে

পেরেছিল। না হলে দেশ ভাগের পরপরই বা পালাবে কেন। অলগির মতো বিলে ঘেরা অজগায়ে তো তখন রাজনৈতিক হাওয়া লাগেনি। জলিলদের মতো লোকেদের বন্ধু ভাবতে অসুবিধা হয়নি। বিলের কই মাছ আর সন্ধ্যাবেলার পিদিম আটকে রেখেছিল গোটা গ্রামটাকে। তবু পূর্ব পাকিস্থান থেকে ওরা পালাল। ওদের ভাগ্য ভাল ওরা পাকিস্থান থেকে এদেশে এসেছে। সস্তায় মুসলমানের বাড়ি আর চাকুরি সবই পেয়েছে। এরা তো আর বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু না। গোপেশ আমার ছোটবেলার বন্ধু। অনেক খুঁজে গোপেশর ঠিকানা পেয়েছিলাম। গোপেশ রিটেয়ার করেছে। ছেলেরা কি সব বড় বড় চাকুরি করে। গোপেশের দয়া হয়েছিল খানিকটা। ওর কনভেন্টে পড়া নাতিকে পড়াতে বলল। বাজারি রেটের থেকে একটু পয়সা কড়ি বেশীই দিত। কিন্তু কিছু দিন পর বুঝতে পারলাম টিউশনটা টিকবে না। ছোট্ট ছেলেটা আমার বাঙাল উচ্চারণে আমারই সামনে এমন হাসত, নিজেকে বড় ছোঁট মনে হত। আমি মহাভারতের কর্ণকে চিনি কিন্তু ইভা ব্রাউনের সাথে হিটলারের সত্যিকারের বিয়ে হয়েছিল কিনা কি করে জানব। আমি জানি অলগির খালে কখন জোয়ার ভাঁটা আসে। কোন মাঝি ভাটিয়ালিটা আব্বাস উদ্দিনের মতো গায়। শেষদিন টাকা আর চা দিয়ে গোপেশের বৌ রেখা বৌদি কিছুটা দোমনা করে বলল— দাদা, আজকালকার ছেলে মেয়ের মতি গতি বোঝা দায়। নাতি বায়না ধরেছে স্কুলের টিচারের কাছে পড়বে। দেখবেন ক'দিন পরে আবার মত পাল্টাবে, তখন আপনিই পড়াবেন। আমার পাট চুকলো। গোপেশ সামনে এলো না। রুটিন ভাঙ্গায় হাতে খানিকটা সময় ছিল। কলেজ স্কোয়ারে কত লোক সাঁতার দেখছে। চম্পাকে কেউ কোনদিন হাতে ধরে সাঁতার শিখিয়েছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁসের মতো ভেসে থাকতো জলে। চম্পা খুঁজতে গেলে আর ভাল লাগে কলেজ স্কোয়ার? বেরিয়েই দেখি কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের গায়ে কল্পতরু। পানের দোকান। কত স্বনামধন্য ব্যক্তিরা কল্পতরুর পান খেয়ে মজেছেন তার তালিকা। প্রমাণ স্বরূপ পানের খিলি হাতে তাঁদের ছবি। কল্পতরুর পান খেলে গলা মিষ্টি হয়ে যায়। মিষ্টি মিষ্টি কথা আসে। আসে মধুর গান। ঠিক মনে নেই; অত ছবির ভিরে নেহেরু-জিন্নার ছাব ছিল কিনা। তাহলে নেহেরুর মুখে এতো মিষ্টি কথার উৎস কি? পার্লামেনটারি প্রোসেডিং-এ এখনও নাকি লেখা আছে নেহেরুর সেই বক্তৃতা, পাকিস্থানে যতদিন একজন হিন্দুও থাকবে, দেশ ত্যাগে বাধ্য হলে ভারতের দ্বার তাদের জন্য খোলা থাকবে। সুনীল, জানি না আপনি নিজে কথা রাখেন কিনা, তবু আপনিই লিখতে পারেন নির্মম সত্য—কেউ কথা রাখেনি / কেউ কথা রাখে না /। নেতাদের অনেক কথার ভীড়ে হারিয়ে যায় কথা। শুধু নেতারা হারায় না। নেতারাই খুঁজে নেয় নেতাদের। আর দেখ, কি অবিশ্বাস্য ভাবে কবর থেকে বেঁচে উঠলেন জিন্না। অথচ হিন্দুদের নিরাপত্তার

আশ্বাস তার ভজনকারীরাই মানে না। কোথায় গেল ডোডো পাখির মত জিন্নার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র? কাঁঠাল গাছে কখনও পাঠার মাংস হয়? ইচ্ছা হয় প্রশ্ন করি—জিন্না সাহেব তা হলে কি আপনিই ওপার বাংলার হিন্দুদের শিখিয়েছেন অলৌকিক স্বয়ংক্রিয় লাইগেশন-ব্যাসিকটমি পদ্ধতি। বংশবৃদ্ধির হার শূন্যে নিয়ে যাওয়ার জৈবিক প্রক্রিয়া। এই দেখ আমার স্মৃতিজড়তা—অ্যামনেসিয়া রোগ এসে গেছে সন্দেহ নেই। নইলে ধান ভানতে শিবের গীত। বলছিলাম কল্পতরুর কথা। কল্পতরুর মিঠা পানের বিজ্ঞাপন দেখে তোমার মায়ের হাতে পানের কথা আবার মনে পরে গেল। কল্পতরুর পানের অনেক দাম। হোক না, টিউশনি ছাটাই-র নগদ বিদায়ের টাকাটাতো পকেটে আছে। রাঙা বৌদির কথা ভেবে একটা পান কিনলে কি খুব বেহিসাবি পানা হবে? হায় কল্পতরু! ফিরোজার হাতে কিমাম দেওয়া পানের খিলি তামাম দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যায়? না কোথায়ও পাওয়া যেতে পারে? তোমার আব্বা নন্দী বাড়ির দালান ভাঙ্গা ইট দিয়ে কি তোমাদের নরম মাটির দেওয়াল কংক্রিট করে দিয়েছে? যেখানে আলো ঢোকে না। ফিরোজার নীল বর্ণের উপর আলো পরলেই যে লাল হয়ে উঠত আকাশ। অলগি, বড়দিয়ায় আকাশে রংধনুর বর্ণালি রাঙায়নি এমন কখনও হয়েছে। তুমি লিখেছে, আকাশে এখন শুধুই কালো মেঘ। কখনও সূর্য দেখা দিলে সেটা রক্ত চক্ষুর মতো জ্বলজ্বল করে। তবু আমি পাখি হতে চাই। ভারি ডানায় ফিরে যেতে চাই বাপ ঠাকুরদার পাশে। আকাশে হয়ত উঠবে দমকা হাওয়া। আমার ধূসর পালক ভেসে যাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে। পালকহীন, দাঁতহীন, নখহীন আমি তীব্র বেগে আছড়ে পরব কাঁটাতারের উপর, আমার হৃদপিন্ড ফুটো হয়ে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসবে নোনতা রক্ত। হয়ত গোটা শরীরটা আছড়ে পরার ভারে ছিঁড়ে যাবে খানিকটা কাঁটাতার। এপার ওপার মিলে মিশে একাকার। আমার মুখে ফিরোজার মিষ্টি পানের খিলি।

পুনশ্চঃ তোমার লন্ডনের ঠিকানা আমার জানা নেই। শুধু অলগি-বড়দিয়া হাতের তালুর মতো চিনি জানি। তাই আপাতত চিঠিটা বালিশ চাপা থাক। আমাদের সংস্কার হচ্ছে দেহ পুড়িয়ে ফেলা, একটা চিঠি খানিকটা হলেও তো দহন মাত্রা বাড়াবে।

বন্দুক, ক্ষমতা এবং

এক

জাঁদরেল পুলিশ অইফসারটা মারা গেল। না, কোনো বুলেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মেই মৃত্যু। উন্নতির শিখরে পৌঁছে অবসর। শুধু পারেনি বার্ধক্যকে অস্বীকার করতে। সে বিশ্বাস করত মানুষ খুব তাড়াতাড়িই বার্ধক্যকে তাড়িয়ে দেবে বিজ্ঞানের যাদু বলে। এবং তার অপরিহার্য্যতা স্বীকার করবে সবাই। বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন। তার মৃত্যুর খবর শুনে কেঁদেই ফেলেছিল রীতা। নিজের কাছেও তার কান্নার ব্যাখ্যা ছিল না। তা হলে কি আনন্দের কান্না। একটা রক্ত পিশাচের মৃত্যু। নরখাদক নখ, দাঁত জ্বলেপুড়ে খাঁ খাঁ হয়ে গিয়েছে। এর পরেও নাকি অস্থিতে কেউ না কেউ শান্তি জল দিয়েছে। দু'চারটা শোকসভা। পুলিশে এমন লোক নাকি কমই আসে। অথচ হৃদয় জলের মধ্যেও এতটা আগুন জ্বলতে পারে, কি করে বুঝবে রীতা? বুকের মধ্যে দাউ দাউ। সে আগুন কখনও নেভে?

রীতার হিট লিস্টে দু'টো মানুষ। তিরিশ বছর ধরে রোমে রোমে পুঁতে রাখা। এক নম্বর ব্যক্তি ফস্কেই গেল। কতবার বাগে পাওয়া গেছে। তার সশস্ত্র বা নিরস্ত্র অবস্থায় কি আসে যায়। রীতার ধারণা ছিল তার নিরস্ত্রই অস্ত্র হয়ে উঠবে। ওঁরা যদি ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি গড়ে অসংখ্য রাজকরের বিরুদ্ধে লড়তে পারে, মুক্তমঞ্চে ঘোষণা হয় ঘাতক গোলাম আজমের মৃত্যু পরোয়ানা, একজন পুলিশ অফিসার কি তার থেকেও শক্তিমান? বিশ্বাস ছিল একটু একটু করে উত্তাল মানুষ তাকে নিয়ে যাবে অন্ধকার গুহায়। রীতাকে জিষ্ণু বলত—জানিস দিদি, মানুষের বড় অসুখ—ক্রমিক সুখে আচ্ছন্ন। আচ্ছন্নতা এক ধরনের রোগ।

জিষ্ণু মানুষের আচ্ছন্ন সুখ ভাঙতে চেয়েছিল। রীতার চেয়ে দু'বছরের ছোট জিষ্ণু প্রেসিডেন্সির ছাত্র। প্রতিদিন পাল্টে যেত রীতার চোখের সামনে। রাতে এক ঘণ্টা দিতেই হবে ভাইকে। জিষ্ণু যেন মাস্টারমশাই। রীতা তার বাধ্য ছাত্রী। বুঝলি দিদি, বুদ্ধিজীবীরাই নেতৃত্ব দেয়। আমাদের নেতৃত্বে লড়াই করবে শ্রমিক কৃষক। প্রায় সব দেশেই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছে বুদ্ধিজীবীরা। আমরা বুদ্ধিজীবীরাও সর্বহারা। বা চমৎকার যুক্তিতো। নিজেদের সুবিধা মতো কিছু একটা দাঁড় করালেই হল? কেন আমাকে তোর বুদ্ধিজীবী ভাবতে অসুবিধা হয়। আমি ইচ্ছা করলেই তোদের লেকচারারদের মতো একজন হয়ে যেতে পারি। ডাক্তার হতে পারি। তুই

জানিস—মাও সেতুং, ফিদেল কাস্ত্রো, চে গুয়েরারের পেশাগত জীবন। মেধাটাই আসল কথা। মানুষগুলোর আচ্ছন্ন সুখ ভাঙতে দরকার বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব। রীতার ধারণা ধাক্কা খায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা মার্কস্‌বাদ পড়েছে কিন্তু জিষ্ণুর বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব তত্ত্ব সে বোঝে না। তার তীব্র বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা রীতাকে স্রোতের মতো টানে। ভাই-এর চুলের মুঠি ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলে—যাও, এবার নিজের পড়াশুনাটি কর।

দুই

—তুমি!

—চিনতে পেরেছ।

—তোমাকে কে না চেনে। তুমি তো সেলিব্রিটি।

—তা বলতে পার। মিডিয়ার কল্যাণে। দরজায় দাঁড়িয়ে রাখবে। বসতে বলবে না। রীতা সরে দাঁড়ায়। অশেষ একটু ঝুঁকে হাঁটে। অশেষ এলো অবশেষে। বুকের মধ্যে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। এখন কি চায় অশেষ। একজন তুচ্ছ স্কুল শিক্ষিকার কাছে বিখ্যাত অশেষের কি-ই বা পাওয়ার থাকতে পারে। সোফায় বসে আছে অশেষ। সাদা চুলেরই পাল্লা ভারী। আরো ফর্সা হয়েছে। চামড়ায় ঢেউ ধরেছে সামান্য।

রীতা দু'কাপ চা নিয়ে এসে বসল। বাড়ীতে আর আছে সরস্বতী। কাজের মেয়ে, কাজের মেয়ে বললে ভুল হবে। সরস্বতী যেন এ বাড়িরই মেয়ে। সরস্বতী এখন মগ্ন হয়ে আছে টি.ভি.-র পর্দায়। ছোটাছে আশা.....। ছোট ঘর সংসার গেরস্থলি।

—বল, কেন এলে এতোদিন পরে?

—ক'দিন হল তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল। আসলে মাঝে মাঝে অতীত বর্তমান দ্বন্দ্ব লেগে যায়।

—অতীত তো তোমাকে কিছু দেয়নি। তুমি এখন একেবারেই বিপরিত মেরুতে। তোমার বিশ্বাস ভারসাম্যহীন উন্নতিতে। ভূমি সংস্কারে উৎপাদন হ্রাস পায়। রাষ্ট্রের ভূমিকা তোমার কাছে পুলিশি। তোমার সমর্থকও কম নেই।

—রীতা ওসব কথা থাক। আমি এসেছি শুধু তোমার কাছে।

—এখন তুমি শুধু নেওয়া দেওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাস কর। আমার কি আছে?

অশেষ ডুবে যায় এক নৈঃশব্দ নিঃসঙ্গতায়। ঠিক, তার জীবন ভরে আছে কোলাহলে। রীতা আর সে দুই মেরুর পথিক। কিন্তু রীতার উষ্ণতা, শরীর ও মনের গভীর অনুভূতিতে গাঁথা ছিলই। নারী যদিও তার জীবনে কম আসেনি। এখনও আসে। শরীরের টানে নয়। ক্ষমতার টানে। কিন্তু কি অদ্ভুত স্রোত বয়ে যায় রীতার জন্য। অশেষের চোখে আবিষ্ট ভাব।

—আমরা কি অতীতে ফিরে যেতে পারি না রীতা?

—অতীতে কখনও ফেরা যায়। ত্রিশ বত্রিশটা বছর তো কম নয় অশেষ। দেখ তুমি-আমি এখন কেউই বিশ্বাস করি না চিনের কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। আমি একটা বামপন্থী দলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্য। জানি আমারও কোন আদর্শে বিশ্বাস নেই। স্থিতাবস্থা আর ছত্রছায়া দু'টোই এখন আমার বড় বেশী দরকার এই অর্থহীন জীবনের জন্য।

—রাজনীতির কথা শুনে শুনে গা ঘিনঘিন করে। তুমি বরং অন্য কথা বল।

—তুমি মেয়েদের শরীর চেন। তাদের রোমে রোমে হাঁটতে তুমি অশেষ। তোমাকে আমি একটু দেরীতে চিনেছিলাম। বয়সের অবাধ্য রোগ আমারও ছিল। যখন নেশা কাটল ততদিনে তুমি আমার শরীর মন দু'টোই চিনে ফেলেছ। এখন আর কি-ই বা পাবে এই পোড়া শরীরে।

—মাঝে মাঝে একটু আধটু সময় তো দিতে পার।

সাগরী বাড়িতে সময়ের কোনো অভাব নেই। রীতার স্কুল আর বাড়ি। সরস্বতী যতীনের মেয়ে। যতীন একদিন মেয়েটাকে হঠাৎ নিয়ে এসে বলেছিল—দিদি মেয়েটাকে রাখ। তোমার ফাইফরমাস খাটবে। তখন সাত কি আট বছরের মেয়ে সরস্বতী। আস্তে আস্তে বাড়ির মেয়ে হয়ে গেছে সরস্বতী। যতীন মাস গেলে টাকা নিয়ে যায়। বলে, সরস্বতী তোমার মেয়ে। আমি গরীব মানুষ। টাকা নিতে লজ্জা করে। কিন্তু কি করব দিদি, গ্রামে যে এখনও চার চারটা মেয়ে আছে। আমি একটা অমানুষ। ছেলে ছেলে করে পাঁচটার জন্ম দিলাম। সরস্বতী ছোট্ট আশায় দিন বাঁধে। সকালের রান্না সে করে, বিকালেরটা চাপিয়ে দেয় রীতার উপর। রীতা সরস্বতীকে ঘিরেই প্রাণের স্পন্দন পায়। প্রোফেসার নিখিলেশ সাগরীর বাড়িতে রাত বাড়ার সাথে সাথে দ্বন্দ্বগুলো প্রকট হয়ে যায়। বিষয়টা জিষ্ণুর মৃত্যু। শূন্যতা শুরু হয়েছিল জিষ্ণুর মৃত্যু দিয়েই। শোক যন্ত্রণায় নিখিলেশ স্বামী স্ত্রীতে একটু একটু করে ক্ষয়ে গেলেন। সরস্বতী ঘুমিয়ে পড়ার পর অন্ধকারে খুলে যায় এক একটা রীল। রীতার চোখে ঘুম আসে না।

পূর্ব সিঁথি তখন সংবাদের শিরোনামে। স্কুল কলেজ জ্বলছে—বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস চাই। দিশাহীন কতকগুলো স্বপ্নাতুর যুবক আর বুটের শব্দ। মায়েরা লুকিয়ে কাঁদত—পাছে পুলিশ জেনে ফেলে কার বাড়ির লাশ। দীপঙ্কর মাইতির লাশ পড়েছিল দু'দিন মতিঝিলে। মেদিনীপুর থেকে বাবা এসে গোপনে দেখে গিয়েছিল। চাষের জমিতে বৃষ্টি হয়ে পড়ত তার চোখের জল। রীতার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে সেই রাতটা—

রাত তখন পৌনে এগারোটা, কড়া নাড়ার শব্দ।

—কে?

—দরজা খোল রীতা। আমি অশেষ, ভয়ার্ত গলা। দরজা খুলতেই হাত বাড়িয়ে দিল অশেষ।

—লুকিয়ে রেখ প্যাকেটটা। তোমার বাবা কি জেগে আছে?

—না, কেন বলতো?

—শোন, আমার আর সময় নেই। তবু বলে যাই আমাদের বড় বিপদ। জিষ্ণুকে ওরা কোঁৎকাই করেছে। স্যারকে ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বল। অশেষ অন্ধকারে মিশে গেল।

রীতা কথা বলতে পারছিল না। কোঁৎকাই শব্দের মানে প্রথম ধাক্কায় মাথায় আসেনি। অন্ধকারে অনুচ্চারিত প্রতিধ্বনিতে খুলে যায় কোঁৎকাই শব্দের মানে। তখন দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা থাকত.......কোঁৎকাই হবে। চূড়ান্ত মানে মৃত্যু, খতম করে দেওয়া। জিষ্ণু নেই। নিজের ঘরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই রীতার। দুরন্ত ভাই-এর জন্য চিৎকার করে কাঁদা যাবে না। প্রেশারের রোগী বাবা সব জেনে যাবে। সব কিছু স্পন্দহীন। স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীর দেহ পড়ে রয়েছে একটা গলির মুখে। দেহ এফোঁড় ওফোঁড় করে বেড়িয়ে গেছে আততায়ীর বুলেট। দুরন্ত জীবন এভাবেই শেষ হয়ে যায়!

জিষ্ণু বলত—জানিস দিদি, আমরা গাই মাও দেজং-এর গান। কিন্তু আমার কেমন ধাঁধা লেগে যায়—চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান হতে যাবে কেন? কেন চারু মজুমদার আমাদের চেয়ারম্যান হবে না? আমার মনে হয় চিন্তার দেশী করণ দরকার। সয়েলটাকে কেউ চিনতে চাইছে না।

—তোর কথাবার্তা ভোটপন্থীদের মতো হয়ে যাচ্ছে না।

—তোদের মতো মেয়েদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আমার দিদি অন্যদের মতো কথা বলবে এটা আমি আশা করি না। ওদের থেকে তুই কি আলাদা কথা বললি? আমার কথাবার্তায় সংশোধনবাদের গন্ধ পায় ওরা। অশেষদাটাও ঐ দলের। তবে দিদি, আমি মাঝে মাঝে ওকে চিনতে পারি না। ভেতরে ভেতরে আমাদের লড়াইটা অনেক কঠিন। জানি না কে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। জিষ্ণু গম্ভীর হয়ে যায়। তখন ভাইকেও রীতার বড় অচেনা মানুষ মনে হয়। জিষ্ণু চিনতে পারে না অশেষকে?

সি.আই.ডি. স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকজন বাড়িটার উপর নজর রাখে নিখিলেশ বাবু বুঝতে পারেন। ছেলের চিন্তাধারার উপর তিনি ব্যক্তিগত প্রভাব ঘাটানোর চেষ্টা করেন না। তাঁর ধারণা সময়টা সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে চলছে। ঘাতপ্রতিঘাতই বলে দেবে কে ঠিক, কে বেঠিক। কিন্তু সে অনুভব করে ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য কেমন ছোট হয়ে আসছে। তাকেও অনুসরণ করে অনেক রহস্যময় চোখ। পিছন ফিরে বার বার দেখতে হয় নিজের ছায়াকে। সেদিন জিরো আওয়ারে ক্লাস নিতে কলেজে ঠিক ন'টায় পৌঁছেছিলেন নিখিলেশবাবু। কলেজ গেট আগলে দাঁড়াল দু'জন

লোক। নিজেদের পরিচয় দিল পুলিশের লোক হিসাবে। তাদের বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত—ছেলেকে সামলান। নিজে সংযত থাকুন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলার পরিণাম নিশ্চয়ই জানেন!

মানুষ অদ্ভুত রকমের ভীতু। বিশেষ করে বাবা-মা'রা। পিতার অন্ধত্ব নিখিলেশ বাবু জয় করেছিলেন কিন্তু আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসল। কথাটা উঠল রাতে ডাইনিং টেবিলে—জিষ্ণু, দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। পড়াশুনোয় মন দাও। শোন, প্রত্যেক বাবাই চায় সন্তানের নিরাপদ জীবন। তোমার মাও রাতে ঘুমোতে পারে না। তা তুমি বোঝ?

—কিন্তু বাবা আমি তো পড়াশুনা ঠিকই করছি। রেজাল্ট কি কখনও খারাপ হয়েছে?

—এখানে শুধু পড়াশুনার কথা হচ্ছে না। আমাদের কোনো আদর্শের কথা ভাবার দিন নেই। এভাবে আতঙ্কিত দিন যাপন করা যায়, তুমি বল? বয়স হলে বুঝবে কাল্পনিক শূন্যতা কত ভয়ানক জিনিস। আমরা চাই তুমি রাজনীতির সংস্রব ছাড়। এদেশে বিপ্লব টিপ্লব কিচ্ছু হবে না।

বাবার দেওয়া লক্ষণরেখা অতিক্রম করেছিল জিষ্ণু এবং জীবন ঝরে গেল যথা নিয়মেই। তখন জিষ্ণু নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ পি.জি. স্টুডেন্ট। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে দু'দল ছাত্রের মধ্যে বড় ধরনের গণ্ডোগোল বেঁধেছিল সেদিন। সাদা পোশাকের অল্প বয়সী পুলিশ ছদ্মবেশে থাকত ছাত্রদের মধ্যে। তারাই আসল কাজটা করত এ ধরনের অ্যাকশনে। টার্গেট আগেই নির্ধারিত থাকত পুলিশের। নিখিলেশ বাবু অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন সায়েন্স কলেজের খবর পেয়ে। পরদিন পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেল রীতাকে। পুলিশের কাছে খবর ছিল রীতার কাছে রিভলবার আছে। বাড়ি তন্নতন্ন করে পুলিশ খুঁজেছিল জাঁদরেল পুলিশ অফিসারটির নির্দেশেই। কিছু নিষিদ্ধ বই মিলেছিল। কোনো অস্ত্র মেলেনি। তারও দু'দিন পর বাড়িতে এসেছিল জিষ্ণুর ডেড বডি। পোস্টমর্টেমে দেহ ছিন্ন ভিন্ন। এনকাউন্টারে নাকি মারা গেছে। পিঠের দিক থেকে হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেছে খুনি গুলিটা। নিখিলেশবাবু আর তার স্ত্রী শুরু করলেন শূন্য জীবন। প্রতিদিন ছিঁড়ে যেত এক একটা তারহীন তার।

তিন

স্কুল থেকে বেরিয়ে রীতা বাস স্টপের দিকে যাচ্ছিল, ফেরার কোনো তাড়া নেই। বাড়ি গেলেই হল। গিয়ে তো সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ। স্কুলে থাকলেই ভাল থাকা যায়। বাস স্টপেজে তখনও অপেক্ষা করছে তরুদি, তারই স্কুলের শিক্ষিকা। তরুদির বাসটাই আগে এলো। এমনই হয় প্রায়দিন। রীতাদের রুটে বাস একটু কম।

এমন সময় একটা ছেলে তার স্কুলের দিক থেকে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে এলো—আপনার নাম রীতা সাগরী।

—হ্যাঁ, কেন বলত ভাই।

—আমি আপনাদের স্কুলে গিয়েছিলাম। দারোয়ান বলল বাসস্টান্ডে পেয়ে যেতে পারি। অশেষদা আপনাকে এই চিঠিটা দিয়েছে। ছেলেটা চলে যাচ্ছিল—ফিরে এসে বলল—অশেষদাকে একটু বলবেন, চিঠিটা ঠিক সময়ে পেয়েছেন। যা রাসভারী লোক। না হলে কিন্তু আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

অশেষের হাতচিঠি—রীতা আজ বিকালে বাড়ি থেকো। আমি একবার যাব তোমাদের বাড়ি। অসুবিধা থাকলে ফোনে জানিও। ফোন নম্বর......। সেই হাতের লেখা। খুব একটা পাল্টায়নি। এখনও খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে অশেষের দু'একটা চিঠি। চিঠি শুরু বা শেষ হতো এভাবে, শোষণহীন পৃথিবীতে তুমি আমি উড়ে বেড়াব এক জোড়া পায়রার মতো। আজ এলে প্রশ্ন করবে রীতা—অশেষ, পায়রার পালকগুলো গেল কোথায়? তার দেহ আছে? মন আছে? মৃত পাখির সাথে ওড়া যায় আকাশে?

অশেষ এলো কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা সাতটায়। অশেষ ধুতি পাঞ্জাবী পরেছে। এটাই এখন ওর ব্রান্ড পোষাক। মিডিয়ার কল্যানে আরো পরিচিত। রীতা সাদা আটপৌরে শাড়িতে দরজা খুলে দিল। অশেষ সিঙ্গল সোফায় বসল। এই সোফাটায় বসতেন নিখিলেশ বাবু। অলিখিতভাবেই এ বাড়িতে নিয়ম ছিল ওখানে অন্য কেউ বসবেন না। বাবার প্রতি ভালবাসা সম্মান বোধ থেকেই চেয়ারটা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেমন স্মৃতির মতো চেয়ারটা আছে এতো বছর পরেও।

এখনও কেউ ওখানে বসে না। ঝাড়পোঁছ করে পরিষ্কার রাখা হয়। অশেষ তাহলে ভুলে গেল সব। রীতার সারা শরীরে ক্ষোভ। তুমি যত বড় হও, সব আসন তোমার নয়। অন্ততঃ এটা গদিও নয় যে ইচ্ছা মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো বসে পড়বে।

—অশেষ তুমি এদিকে এসে বসো। ওটা বাবার চেয়ার।

—ও হ্যাঁ, এই দ্যাখো। আমার মনে রাখা উচিত ছিল। অশেষ অন্য একটা চেয়ার টেনে বসে ব্যাপারটাকে সামলে নিল।

—বল, আবার কেন এলে।

—রীতা, আবার একই কথা বলছি। আমরা পিছন টাকে কি ভুলতে পারি না।

—ভুলতে পারাটা নির্ভর করে মানুষের গতিময় জীবনের উপর অশেষ। আমি কি পেরেছি জীবনে যখন যা পাওয়ার কথা ছিল তার সাথে তাল মিলাতে। তাহলে আমার আর থাকে কি? অতীত। দেখবে আমার কাছে অতীত এখনও

কেমন অক্ষত অবস্থায় আছে। দেখবে অশেষ? অশেষের উত্তরের সময় না নিয়েই রীতা ঘরের মধ্যে চলে গেল। রীতার সারা শরীরের ভাষা পাল্টে গেছে। ঘরের মধ্যে যেতে যেতে রীতা অনেকটাই অদৃশ্য ছায়ায় আবৃত্ত। অশেষের কাছে আর নিজের তালুর মতো চেনা নারী মনে হচ্ছে না। যে অতীতকে ভোলে না সে সত্যিই ভয়ঙ্করের পূজারী। রীতা ফিরে এলো অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। অশেষকে তাক করা রিভলভার— অশেষ, তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস?

—ট্রিগার থেকে আঙুল সরাও রীতা। ওতে এখনও গুলি আছে। বিপদ ঘটে যাবে—অশেষ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

—তাহলে চিনতে পেরেছ অতীতকে। হ্যাঁ, এখনও পাঁচটা গুলিই বাকি আছে, একটা গুলি নেই। তার হিসাব তুমিই জান। আমার অনুমান আমিও জানি। আমি আর বিশ্বাস করি না বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। আমি বিশ্বাস করি নিয়তিকে। না হলে তুমিই বা কেন ফিরে আসবে মৃত্যুর মুখে। মরার আগে শুনেছি সবাই সত্যি কথা বলে—তুমি একটা কথার উত্তর দেবে অশেষ। জিষ্ণুকে কে মেরেছে?

অশেষ পাঞ্জা লড়ছে অনেকগুলো প্রশ্নের সাথে, মৃত্যুর সাথে। এখন আর সোনালী রোদ নেই, আকাশ নেই। কোলাহলে চেনা সঙ্গী খোঁজার তাড়া নেই। অতীত বর্তমানের দ্বন্দ্বে শূন্য হয়ে যাচ্ছে অশেষের ভাবনা।

—জানি এর উত্তর তুমি কোনো দিনই দেবে না। তবু তোমার জেনে যাওয়া উচিত আমি কতটুকু জানি। জিষ্ণু যে রাতে খুন হল, সেই রাতে তুমি প্যাকেটটা দিয়ে গেল। রাতে কোনো হুঁস ছিল না। আর কি আছে সকালে খুলে আঁৎকে উঠেছিলাম। কি করি, এটাকে নিয়ে। বাড়ির পিছন দিকটায় নারকেল গাছটার গোড়ায় পুঁতে দিয়েছিলাম। বডি আসার আগে আগেই। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। বাড়িতে নাকি অস্ত্র আছে। খানাতল্লাসির নামে চলল পুলিশি লুটতরাজ। আমাকে অসহায় মৃত ভাইয়ের দেহ আসার আগেই তুলে নিয়ে গেল ওরা। আলো আঁধারি কক্ষে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার জেরা করছিল—রিভলভারটা কোথায় রেখেছ বোন।

—না, আমি জানি না কিছু। আমরা মেয়েরা লতার মতো। জিষ্ণু নেই। অশেষকেও কি করে হারাই। জান, আমি কি বোকা তখনও ভাবছি, অশেষ ফিরে আসবে একদিন। মুক্তি তো পেতেই পারি যে কোনোদিন যদি না মৃত্যু হয়।

জাঁদরেল পুলিশ অফিসার নম্রভাবে বলল—আমি জানি। তোমার কাছেই রিভলভারটা আছে। আমি তখনও যুক্তি দিতে চেষ্টা করছিলাম—আমার মতো একটা মেয়ের কাছে কেন থাকতে যাবে রিভলভার। পাশে দাঁড়ানো পাঁচ সাতজন পুলিশ গোঁফের ফাঁকে হাসছে। সে বলল—সতী বোনটি দেখছি কিচ্ছু জানে না। দেতো মাগির শরীরে তোদের ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দে। পুরুষ মানুষের সুবিধে ডাণ্ডার মতো

অস্ত্র নিয়েই জন্মায়। এক-দুই-তিন-চার। ছিঁড়ে যাচ্ছে শরীরের তন্ত্রী। অফিসার চুরুট টেনে যাচ্ছেন নির্বিকারে। ছিঁড়ে যাচ্ছে তন্ত্রী। পাঁচ-ছয়। ঘরের মধ্যে যে বাল্বটা তারে ঝুলেছিল সে লাঠির এক পিটানে ভেঙ্গে দিয়ে বেড়িয়ে গেল। সাত........

—আমি মুক্তি পেয়েছি। তুমিও ফিরে এসেছ অশেষ। মেয়েদের শরীর ছাড়া অন্য কিছু ভেবেছ কিনা আমার জানা নেই। আমার কাছে কি চাইতে এসেছ তুমি একবার দেখে নাও। রীতা অশেষের সামনেই সমস্ত বস্ত্র একে একে খুলে ফেলল। স্তন দু'টোয় মালার মতো চুরুটের ছ্যাঁকার দাগ। দু'পায়ের জঙ্ঘা পুড়ে অনুর্বর মরুভূমি। তোমার চাওয়া পাওয়ার হিসাব মেলে অশেষ? তোমার এই অস্ত্রের জন্য আমার সারা শরীর পুড়েছে। আমার ছোট ভাই........ কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে রীতা।

—রীতা তুমি শোধ নাও। আমার বাঁচার মানে হয়না। কালঘামের মতো জল আশেষের শরীর বেয়ে নেমে যাচ্ছে তিরতির করে।

না, অশেষ! তুমি চলে যাও। তুমি তো অনেক আগেই মরে গেছ। মরা মানুষকে মারা যায় অশেষ?

গুড়িয়ার খেলাঘর

দাওয়ার পাশে ক্ষয়ে যাওয়া ইটের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে গুড়িয়া। রাত দুই প্রহরের বেশী। শুক্লপক্ষের নিবু নিবু আকাশ। গোয়ালে একটা মোষ জেগে আছে। খচ্‌মচ্‌ জাবর কাটার শব্দ। অনেক কথাই উগরে আসছে গুড়িয়ার। জীবনে এত গভীরভাবে তিনপক্ষের উপস্থিতি অনুভব হয়নি আগে কখনও। সব সমস্যার সমাধান যদি মৃত্যুতেই হতো, কত সহজ হয়ে যেত সব। পোয়াতি পেটে হাত দিয়ে গুড়িয়া বুঝতে পারছে তা হবার নয়। আল্লার দেওয়া জীবন নেওয়ার অধিকার তার নেই। কোন সিদ্ধান্তই নেওয়ার অধিকার তার নেই। এমন কি আত্মহত্যারও। যারা মরে, অনেক কিছুর প্রতিকার চেয়েই মরে। কিন্তু কে খোঁজ রাখে অতসবের। পেটেরটা না এসে গেলেও হয়ত চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। গুড়িয়ার কোন ইচ্ছা থাকতে নেই। গুড়িয়া একটা পুতুল।

—গুড়িয়া! —গুড়িয়া! জামাল লুঙ্গি ঠিক করতে করতে অন্ধকার ঘর থেকে উঠোনে বেরয়। এক চিলতে উঠোনে। এই মফস্বল শহরে উঠোন এখনও লন হয়ে ওঠেনি। উঠোনটা আগে খানিকটা বড় ছিল। পাঁচ ভাই খুপড়ির মতো ঘর করে যে যার মতো থাকে। পুরানো ঘরটায় এখনও বাবা মা থাকে। এই উঠোনটুকুও যাবে কোন দিন। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে কেউই খুপড়িতে এঁটে উঠতে পারছে না। জামাল গুড়িয়ার গা ঘেসে বসে। গুড়িয়ার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে— একটু ঘুমাতে পারলে না বিবি। গুড়িয়া অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে নেয়। ভেসে আসে একটানা জাবর কাটার শব্দ। আর মোষের লেজ নেড়ে মশা তাড়ানোর শব্দ। জামাল গুড়িয়ার হাত ধরে বলে— চলো, ঘুমাবে।

—না, আমার ঘুম আসছে না। তুমি যাও।

—আমারও ঘুম আসছে না। উঁচু বালিশটা মনে হচ্ছে তোমার পোয়াতি পেট। বালিশটার মধ্যে কেমন যেন ধুকধুক। ঠিক যেমন তোমার পেটের মধ্যে কচি ছাওয়ালটার নড়াচড়া। জামাল পোয়াতি পেটে আলতো করে হাত রাখে। গুড়িয়া জামালের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে—হ্যাগো, আমরা পালিয়ে যেতে পারি না?

—পালিয়ে! কোথায়?

—দুনিয়ায় একটুও জাগয়া নেই, যেখানে তৌফিকের চোখ যাবে না। তোমার ল্যাড়কা-ল্যাড়কি নিশ্চিন্তে জন্মাতে পারে।

—চুপ করো বিবি। খোদার বিধানের বিরুদ্ধে এসব কথা বলা গুস্তাফি। পাক জেলও ধরে রাঁখতে পারেনি তৌফিককে। আমাদের মতো বান্দাদের খুঁজে বের করতে পারবে না, তা কখনও হয়? জামাল ভীবু শিশুর মতো আঁকড়ে ধরে গুড়িয়াকে।

বিধান! বিধান! সেই দুপুর থেকে শুরু হয়েছে খোদার নামে বিধানের খেলা। অনেক মাথা মিলে হাদিশ কোরানের চুলচেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। উপস্থিত অঞ্চলের মহিলা সরপঞ্চ অঙ্গরা সিং। তার স্বামী বিষান সিং। গ্রামের বেশীর ভাগ লোক বিষান সিংকেই সরপঞ্চ বলে জানে। এ দেশে অঙ্গরা সিং, রাবরিরা দাদার খরমের মতো। নেপথ্য নায়ক অন্য কেউ। আর আছে মুফতি, মওলা, মাতোয়ালীর মতো অনেকে। দাওয়ার এক কোনে গুড়িয়া গুটিসুটি মেরে জড় বস্তুর মতো বসে আছে। গুড়িয়া জানে মাতব্বরদের সামনে কথা বলতে নেই। নেই কোন ইচ্ছা থাকতে। যার পুতুল সে-ই তাকে নিয়ে খেলবে।

হাফিজ মাওলা সবার চেয়ে প্রবীন। সাদা পাকা চুল দাড়ি, ইসলামি আইনে বিজ্ঞ। সালিশী সভা তাকে বলতে বলে। তিনি শুরু করেন এভাবে—দ্যাখেন প্রধান সাহেব, সবার উপরে আমাদের শরিয়তি আইন কানুন। সমাজের হালাল বজায় রাখতে হলে তা আমাদের মান্যি করতেই হবে। খোদার আইনের উপরে তো আমরা কেউ নই। গুড়িয়া বহিনের দ্বিতীয় নিকাটা মোটেই বিধি সম্মত নয়। হালাল না হলে মেনে নিই কি করে? তাছাড়া তৌফিকও তাকে তালাক দেয়নি।

জামাল মৃদুস্বরে বলার চেষ্টা করে—আপনারাই তো বিধান দিয়েছিলেন, তিন বছরের বেশী নিরুদ্দেশ থাকলে তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়। আল্লার ইচ্ছায় মৃতের বেওয়া আবার নিকা করতে পারে। হুজুর আপনার সম্মতি নিয়েই আমাদের নিকা হয়েছিল।

ইয়াকুব মিঁয়া জামালকে থামিয়ে দেয়—তুমি থামো জামাল। হাফিজ হুজুরের মুখে তুমি হাদিশের বাইরে কোন নিদান পাবে না। আর তৌফিক জলজ্যান্ত মানুষটা ফিরে এলো। তার বউ ফিরিয়ে পাবার দাবী তুমি অস্বীকার কর কি করে। তুমি ব্যাটা মানুষ, তোমার মাইয়া ছেলের অভাব হবে? তুমি আরো তিনটা বিয়া করতে পারবে। কি কন অঙ্গরা বহিন।

প্রধান অঙ্গরা সিং তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। বিষান সিং ইয়াকুব মিঁয়াকে সমর্থন করে—হ জামালভাই, আগে সমাজ তারপর ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা। মওলা সাহেব কি আর না জেনেশুনে এ নিদান দিয়েছেন। আমরাও চাই আপনাদের সমাজের আইন কানুন বজায় রেখেই সবার উন্নতি। মহিলা প্রধান তার স্বামীর পাশে চিত্রবৎ বসে। মাঝে মাঝে পুতুলের মতো ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে। ঘোমটার আড়ালে ফেটে যাচ্ছে গুড়িয়ার বুক। তার ধারণা ছিল জামাল চিৎকার করে বলবে—মানি না আপনাদের বিধান। যে নিকায় আপনারাই মত দিলেন, কলমা পড়ালেন, পাত

পেতে বিরিয়ানী খেলেন, আর এখন বলছেন—যেহেতু কাজির কাছে কলমানামা লেখা হয়নি, তাই তৌফিকেরই হক আছে বউ ফিরে পাওয়ার। কিন্তু না জামাল অনেক আগেই মিঁইয়ে গেছে। সালিশি সভার নিস্তব্ধতা ছারখার করে দিচ্ছে গুড়িয়াকে। নিঃসঙ্গ ঘরে টিকটিকি ডাকার শব্দ। টিক্ টিক্ ....। হাফিজ মওলা সাদা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে দেখছেন মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা। গুড়িয়া ডুকরে কেঁদে উঠে—সব ভুল। সভার মুরব্বিরা তাকে সান্ত্বনা দেয়—আল্লার দোয়া মাগো বহিন। আল্লা তোমার মঙ্গল চাইছেন। ইনসাল্লা, আমরা তোমার সাথে আছি।

উলম্বরেখার মতো বেড়ে যাচ্ছে তৌফিকের স্মৃতি। বরের বেশে তৌফিক—ও নওসা মিঁয়া। নওসা মিঁয়া, দিল লে জায়েঙ্গে দুলহানিয়া। তের দিনের জোয়ারে ভাসানো তৌফিক। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত তৌফিক। যুদ্ধ পালানো দেশদ্রোহী তৌফিক। বীরের বেশে ফিরে আসা দেশপ্রেমী তৌফিক। তৌফিকের এখন কি নেই—টাকা-পয়সা, মান-মর্যাদা। হায় আল্লা, নগন্য গুড়িয়াকে উদ্ধার করতে না পারলে নাকি মর্যাদা হানি হবে। তবু তৌফিকের এতো রং মিশে কিছুতেই সাদা হচ্ছে না গুড়িয়ার মনে। সে শাদির তের দিনের মাথায় শরীরের বাঁধ ভেঙে দিয়ে চলে গেল কার্গিল যুদ্ধে। প্রতিদিন মনে মনে বার্তা পাঠাত গুড়িয়া—ফিরে এসো তৌফিক। যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তা কর শরীরের সাথে। গোপনে গোপনে উষ্ণ হয়ে যেত গুড়িয়া। উষ্ণতা অলক্ষ্যে কার্গিলের বরফে ঢাকা পড়তে লাগল আস্তে আস্তে। দিন গুনতে গুনতে কবে যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল মাত্র তের দিনের অনুভূতি।

জুম্মা বারের বিকালে মসজিদ থেকে সে আসছিল আজানের ধ্বনি—আল্লাহু আকবর। খবর এলো তৌফিক নেই। গুড়িয়ার সারা শরীর জুড়ে তখনও তৌফিকের শরীরের গন্ধ। ওইটুকুই তো চেনা মানুষটার। মৃত্যুতে তবু একটা সমাধান ছিল। বীর শহীদের স্ত্রীর মর্যাদা। অথবা আর একটা নতুন বন্ধন। কিন্তু তিন দিনের মাথায় বাড়িতে ভারী বুটের শব্দ, তৌফিক কার্গিল থেকে পালিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র পালানো আসামী। দেশদ্রোহীর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়েছে। কোর্ট মার্শাল হবে। গুড়িয়ার ছোট্ট জীবন দিয়ে অনুভব করে মানুষ চোখে কত ভাষায় কথা বলে। কৌতুক, ঘৃণা, লোভ। ঘৃণা দেশদ্রোহী সৈনিকের স্ত্রীর প্রতি। নারী খাদকদের লোভ গুড়িয়ার শরীরের গন্ধে। তবু গুড়িয়া রোজ দরজা খুলে শোয়—পালাও, পালাও তৌফিক। মানুষ না মেরে পালাও। না মরে পালাও। উষ্ণ বুকের আঁচল দিয়ে লুকিয়ে রাখব তোমাকে। তিন বছর ধরে আগল খুলে রাখতে রাখতে চোখে আর একটুও জল নেই গুড়িয়ার।

আশ্রিত কুকুরটা অনেকক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে ঘুমাচ্ছে নিশ্চিন্তে। কুকুর কুন্ডলীতে ঢোকানো মুখ। শুক্লপক্ষের শেষ রাতের অন্ধকার মুড়ে দিয়েছে পুরো মহল্লা। গ্রাম ভাঙা ঘিঞ্জি মফস্বল শহরের মহল্লা। ছড়ানো ছিটানো দু'একটা রাস্তার বাল্ব টিমটিম করছে। খাটিয়ায় ঠায় বসে জামাল গুড়িয়া। গুড়িয়ার মাথায় এখনও ঘুরছে প্রশ্নটা,

অঙ্গরা বহিন প্রধান হোক আর নাই হোক, মেয়ে তো। চিমটি কাটলে একই রকম ব্যাথা লাগে। পেটে সন্তান এলে দশ মাস বয়ে বেড়াতে হয়। সে অন্তত বলতে পারত এ হয় না। পেটে জামালের পোলাপান নিয়ে আবার কি করে ফিরে যাবে আগের স্বামীর ঘরে। গুড়িয়ার ইচ্ছা হয়েছিল—ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রধানের উপর। কামড়ে আঁচড়ে ফালাফালা করে দেয় তার শরীর। একটা মেয়ে হয়েও মেয়ের যন্ত্রণার একটুকুও শরিক হবে না। বুঝবে না—তৌফিক এখন আর তার কেউ নয়। তিন বছর ধরে তৌফিকের ছায়ার সাথে লড়তে লড়তে জামালই তার খড়কুটো। আর তৌফিকের এখন সব আছে। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র তার সাথে। গুড়িয়ার চোখ লগ্ন হয়ে আছে ইজলের মতো জামালের দিকে। জামাল রেডিও টিভির শরীরে জট পাকালে ছাড়াতে পারে। তার মোকনিক মাথায় ফতোয়া তোলার কোন সার্কিট নেই। পুরো স্ক্রিন জুড়ে সাদাকালোয় লাফালাফি। মেমারি থেকে উঠে আসছে না কোনো লিপি, কোনো ভাষা।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর জামাল হঠাৎ বলে—আমাদের নিকাটা না হলেই ভাল হতো। তুমি চলে যাবে। আমার আর কি থাকল।

—তোমার বাচ্চা?

—কেন শুনলে না, মাতব্বররা বলল—বাচ্চা যেহেতু তৌফিকের ঘরে জন্মাবে, বাচ্চাও তার। তৌফিক রাজি হয়েছে বাচ্চার দায়িত্ব নিতে।

—তুমি চুপ করে থাকলে কেন?

—খোদার বিধানেই নেই, আমার কথা ওঁরা শুনবে কেন। কষ্ট কি আমার কম হচ্ছে বিবি। তুমি কি ভাব আমি যন্ত্র সারাতে সারাতে যন্ত্র হয়ে গেছি। তোমাকে শাহবানু আপার কথা বলেছি না। সবাই আমাদের সমাজের নামে দোহাই দেয়। জানো বিধানেরও একটা মোহ আছে। নইলে বিধান বা ফতোয়া দিয়ে সবাই যে লাভবান হচ্ছে তা নয়। ধর, তোমার আমার ছাড়াছাড়ি করে ওরা কি পাবে। এক ধরনের আদিম আনন্দ যা মোহগ্রস্থ মানুষের মধ্যে থাকে। ওসব থাক, চলো শেষ রাতটুকু ঘুমাবে। সকাল সকাল ওরা তোমাকে নিতে আসবে। জামাল আসমানের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিল। আকাশটাই যা বড়। গুড়িয়া চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তৌফিক মহা ধূমধাম করে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। সাজানো গুছানো ঘোড়ার গাড়ি। টগবগ করে ছুটছে যেন যুদ্ধ জয়ের ঘোড়া। রাস্তার দু'ধারে কৌতুহলী জনতা। কেউ কেউ আনন্দে উদ্বেল তওবা, তওবা। তৌফিক ভাই দেখিয়ে দিল মর্যাদা কি করে আদায় করে নিতে হয়। তোফিকের মুখে চওড়া হাসি। পাশে ঘোমটার মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া শামুকের মতো গুড়িয়া।

—মিঁয়া তোমার মনে পড়ে তৌফিক যেদিন পাকিস্তানের জেল থেকে ফিরে এলো ওয়াঘা বর্ডার দিয়ে, সেদিনের কথা?

—আমিই তোমাকে তৌফিক ভাইর খবরটা প্রথম দিয়েছিলাম। দু'দিন আগে

পেপারে বেরিয়েছিল তার বেঁচে থাকার কথা, তার সাহসের কাহিনী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিভাবে পাক সেনাদের ফ্রন্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। মরে যাওয়া মানুষটা কিভাবে বেঁচে উঠল।

—তোমার একটুকুও ভয় করেনি তখন।

—কিসের ভয়। তৌফিকভাই-র জন্য আনন্দ হয়েছিল। এই পুঁতি গন্ধময় মহল্লাটাকে কে চিনত। তৌফিকভাই-র জন্য আজ সবাই চেনে। তখন ইচ্ছা হতো ওকে একটু ছুঁয়ে দেখি মাটির মানুষ, না বেহেস্তের পীর ফেরেস্তা।

আনন্দের কথা মনের মধ্যে চেপে রেখেছিল গুড়িয়া। সেকি উত্তেজনা। ওয়াঘা বর্ডার দিয়ে ঢুকছে তৌফিক, উজির নাজির কে নেই সেখানে। মুখ ঝলসে উঠছে ফ্লাস গানের আলোয়। দেশ বিদেশের টিভিতে শুধুই তৌফিক। আনন্দ সবার সাথে ভাগ করতে পারেনি গুড়িয়া। দরজার আড়াল থেকে সারাক্ষণই দেখেছে তৌফিকের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন। গুড়িয়া নিজের গায়ের সাথে নাক ঘষেছিল—তের দিনের গন্ধ আছে নাকি। না, ভারী শরীরে শুধুই জামালের সন্তানের গন্ধ। বর্ডার পেরিয়েই তৌফিক তার ভাবীর কাঁধে মাথা রেখে শিশুর মতো জিজ্ঞেস করেছিল—

—গুড়িয়া আসেনি কেন? দরজার আড়ালে গুড়িয়ার সংসার তখন ভাঙছে। শীতল শরীরের স্পর্শে পেটের দস্যিটাও যেন থ্ মেরে গেছে। তৌফিকের গুড়িয়া খোঁজায় কেমন জটিল হয়ে গেল তার সহজ সরল জীবন আর সম্পর্কগুলো।

এক নাগাড়ে বসে থাকায় গুড়িয়ার শরীর আর বইছে না। কোমরের পাশটা টনটন করছে। বেশী কষ্ট পেটেরটার। ঘামিয়ে যাচ্ছে গুড়িয়ার শরীর। গুড়িয়া ধরা গলায় জামালকে অনুরোধ করে—শোন কুট্টিটা কেমন যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। একটা শেষ চেষ্টা করে দেখলে হয় না গো।

—আমার কোনো ক্ষমতা নেই মওলার ফতোয়ার বিরুদ্ধে লড়ার। জামালের অসহায় গলা।

—না না, আমি ও সব বলছি না। তুমি তৌফিককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। আর যেন এক দিনের জন্যও সূর্যের মুখ দেখতে না পায়—চাপাস্বরে গুড়িয়ার মরিয়া ভাব।

—আঃ! বল কি? জামালের আতঙ্কিত চোখ।

—দেখি, তোমার বুক। লোমশূন্য বুক হলে তোমার মধ্যে সীমারের মতো নিষ্ঠুর রুক্ষতা আছে। গুড়িয়া অন্ধের মতো হাতড়ে যাচ্ছে জামালের বুক। হায় হাসান! হায় হোসেন! এখানে সীমার নেই। নেই তার ধারালো তলোয়ার। দূর থেকে ভেসে আসছে ফজরের আজান—আল্লাহু আকবর। জামালের বুকে গুড়িয়ার চোখের জলে ঘোর বর্ষা। বুক জোড়া সবুজ চারার ধান ক্ষেত। পাতায় পাতায় উথালি পাথালি। তখন আল ধরে মালিকের মতো হেঁটে যাচ্ছে তৌফিক।

দ্বিতীয় যুদ্ধের সৈনিক

—তা হলে আপনিই বলুন স্যার, ধনী দরিদ্রের ফারাক মিটবে কিভাবে। বোর্ড সদস্যরা অবাক। ক্যান্ডিডেট কিনা উল্টে প্রশ্ন করছে? উত্তর ঠিক না হলে সঠিক উত্তর বাতলে দিতে। বোর্ড সদস্যদের মুখই বলে দিচ্ছে পরীক্ষার্থীকে তাড়াতাড়ি বিদায় করা ভালো। অধিকাংশের উস্‌খুশ ভাব। কিন্তু চ্যালেঞ্জটা তো সরাসরি আমাকেই। সমাধানযোগ্য উত্তর না দেওয়া মানে মেয়েটির কাছে হেরে যাওয়া। অবশ্য উত্তর দেওয়া না দেওয়া সবটাই আমার ব্যাপার। সদস্যদের যা শরীরী ভাষা মনে হচ্ছে না কেউ চাইবে এরকম একটি একরোখা মেয়েকে সিলেকশন করতে। আমি কি উত্তর আশা করেছিলাম? তোতার মতো আওড়ে যাওয়া উন্নয়নের পশ্চিমী মডেল। তাতে আমার স্বাধীনতা কোথায়? মৌলিকত্ব কোথায়? আমার অহংবোধকে এভাবে ধাক্কা দেবে হাঁটুর বয়সী একটা মেয়ে? না, এ মেয়ের মধ্যে দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। গভীর আত্মচেতণ চোখ অথচ সরলতার ছুঁয়ে যায় হৃদয়। মনে হয় কত কালের চেনা। সমস্যাটা এখানেই, মানুষের সরলতায় মিশে থাকে প্রবহমানতা। চিনি চিনি মনে হয় তাকে। গুলিয়ে যায় একের মুখে অন্যের মুখ। মুখের ভীড়ে।

গাড়িটা ছুটেছে তির বেগে। ধানক্ষেত সবুজময়। দিগন্তে ছবির মতো গ্রাম। গ্রামগুলি ছুটছে পিছনে। গতির একটা মোহময় রূপ আছে। ছুটন্ত গ্রামগুলি ডুবে আছে সেই রূপে। যেন তার হাহাকার নেই, নেই বেদনার লেশ মাত্র। মেচেদা থেকে তমলুক আসতে সময় লেগেছে ঘন্টাখানেক। রাস্তার বুক কালো চকচকে মসৃন। গ্রামের বুক চিরে কাঁথি হয়ে রাস্তা চলে গেছে দীঘা। সমুদ্র প্রমোদনগরী যেন হাতছানি-দিচ্ছে, আয়রে নেচে যা ঢেউ-র মাথায়। ন্যাংটা পুটো গায়ে লেগে যাক বালির চিক্কন। তমলুকের ঘিঞ্জি কাটিয়ে গাড়িটা আবার ছুটছে স্বাভাবিক গতিতে। ছোট্ট একটা গঞ্জে ঢোকার মুখে হঠাৎ আটকে গেল রাস্তা। সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে পরেছে। অনেকের মধ্যে প্রমোদ নগরী যাওয়ার তাড়া। অসহিষ্ণু সুমোয় হুল্লোড় পার্টি। হাওয়ায় ওড়া চুলে উচ্ছল যুবতীর দল, সাথে বোহেমিয়ান যুবক। গাড়ি থেকে বোঝা যাচ্ছে না ট্রাফিক জ্যামের কারন কি। ড্রাইভার ফিরে এসে জানালো —স্যার, আর বলবেন না, হাঁড়িয়া খেয়ে ক'টা সাঁওতাল রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। সরকার শালাদের লাই দিয়ে মাথায় তুলেছে।

—সেকি, কেউ সরিয়ে দিতে পারছে না?

—কি করে পারবে স্যার, ওদের নেতা আছে। গিয়ে দেখুন স্যার, সাঁওতাল-গুলোকে প্রধান ফোদান বানিয়ে দিয়েছে সরকার। ওদের নিয়ে মাতামাতি তো আর কম হচ্ছে না।

ইচ্ছা হল একবার দেখে আসি হচ্ছেটা কি। আমার তাড়া নেই সমুদ্রপারে যাওয়ার। আমার গন্তব্য জুনপট। কল্পলোকের গ্রাম। দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের গর্জন। সামনের দিকে এগিয়েই বুঝতে পারলাম এখানে হাটবার। রাস্তার ধারেই অধিকাংশ দোকানপাট। খানিকটা আগে মূল হাট। বাঁশের মাচায় অস্থায়ী খড়ের ছাউণী। হাট যেখানে বসেছে তার থেকে একটু দূরে হাঁড়িয়া বিক্রি করছে বেশ কিছু সাঁওতাল রমণী। চক্‌চকে অ্যালুমুনিয়ামের হাঁড়িতে পচই। বিকিকিনি খাওয়া সবই চলছে অবাধে রাস্তার ধারে। চার-পাঁচজন প্রায় বেহুঁশ। রাস্তা জুড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কালো কুচকুচে শরীরে বসন বলতে হাঁটুর উপর খাটো করে পড়া ধুতি। ছেঁড়া-ময়লা। তাদের মেয়ে বউরা ডুরে শাড়িতে এক বসনা। হাড়গিলে চেহারার মানুষগুলোর কান্ড দেখতে উৎসুক লোকের ভীড়। মাঝে মাঝে টিপ্পনী—শালাদের ভাত জোটে না মাল খায়। কেউ একজন বলল—দাদা, ওসব বলবেন না। সাবধান, সর্বনাশ হয়ে যাবে। তীর টির মেরে দেবে। পাশে ক্ষেতিজমিতে জমেছে মুরগির লড়াই। গোল হয়ে দেখছে আদিবাসী জনতা। অন্যরা নেই তা নয়। তবে সংখ্যায় কম। স্পষ্ট কক্ কক্ আওয়াজ। লাগা ছুরি, উর মুরইগাটাকে মিরে দে, মিরে দে। কুতো কাইল মুরইগা খাইনি।

—কি বইল্লি, হামারটাকে মিরে দিবেক। তুর মরইগা কিটে ফালা ফালা কোরে দিবেক। হুড়, হুড়। দিখব বটেক তুরটার ক্ষমতা।

রাস্তার উপরে আরেক লড়াই। প্রায় বেহুঁশ মরদদের বাড়ি ফিরানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের বউরা। কখনও কখনও টালমাটাল পায়ে জড়িয়ে ধরছে বউদের গলা। দু'এক পা হেঁটে আবার গড়াগড়ি যাচ্ছে রাস্তায়। হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলছে। বউরা যেন তখন সন্তান বৎসল মা। মরদ কাঁদলে প্রাণটা যে বড় খাঁ খাঁ করে।

মাথা জুড়ে আছে সেই শ্লেষ—ব্যাটাদের ভাত জোটে না মাল খায়। সত্যিই তো ওদের ভাত জোটে না। ভাত পচিয়ে খায়। কিন্তু কেন খায়? কোন দুঃখে হাঁড়িয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে? আদিবাসী উন্নয়নের কোটিকোটি টাকা যায় কোথায়? তার ভোক্তাকারা? একের পর এক প্রশ্ন ভীড় করছে আমার মাথায়। এই প্রশ্নগুলোই তো ছিল নীলার। সেই মেয়েটির। তা হলে নীলা কি আমার মগজ ধোলাই করল নাকি? আমার প্রশ্নের উত্তর নীলা শুরু করেছিল এভাবে—ভারসাম্যহীন উন্নতি মানে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কলকারখানা কয়েকটা উপনগরী,

কৃষিক্ষেত্রে কিছু ভর্তুকি আর গরীব-আদিবাসী উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা। তাতে ধনী গরীবের ফারাক দূর হয় না। কৃষি-শিল্পের সমন্বয়ও থাকে না। এ মডেলে দেশ যদি এগোতো তা হলে এখনও এতো মানুষ খেতে পায় না কেন?

—তুমিই তো স্বীকার করেছ কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি, আদিবাসী উন্নয়নের টাকাও ভারসাম্যহীন উন্নয়নের অংশ। কল্যাণকর রাষ্ট্রের ভূমিকা আর কি হতে পারে।

—না স্যার, আমি সেই অর্থে বলিনি। ভাবা হয় দু'দিক থেকে উঁচু হলে মাঝখানের জায়গা অর্থাৎ দারিদ্র্য দূর হয়, বাস্তবে তা হয় না। আসলে এরকম সমাজ ব্যবস্থায় যাদের জন্য ব্যয় করা হয় তারা খুব সামান্যই উপকৃত হয়। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যাবে—সাধারণভাবে পঞ্চাশ শতাংশের বেশী কোন এলাকার জনসংখ্যা আদিবাসী হলে সেখানে আদিবাসী উন্নয়নের টাকায় স্কীম নেওয়া হয়। ধরা যাক সে রকম একটি এলাকায় ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের অধীনে শ্যালো পাম্প বসানো হল। কারা উপকৃত হবে? উপকৃত হবে অন্য সম্প্রদায়ের বৃহৎ চাষীরাই। কারণ আদিবাসীদের জমি তো দশ শতাংশেরও কম। আর সব ধরণের ভর্তুকির টাকায় ধনীরা উপকৃত হয় বেশী একথা সবাই জানে।

—তা হলে সমাধানের উপায়টা কি? নীলাকে আর একটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা হল। বেশী কথা বলা প্রার্থীদের ট্রাপে ফেলার পদ্ধতি।

—স্যার, আমার মনে হয় সমাধানের রাস্তা আছে। ভর্তুকি ব্যাপারটাই তুলে দেওয়া যেতে পারে। ভর্তুকি দিয়ে ধনীশ্রেণী পোষার মানে হয় না।

—আঃ বলে কি? মেয়েটা কোনো প্রতিক্রিয়াশীল দলের সদস্য নয় তো।

—হ্যাঁ, সত্যিকারের গরীব মানুষের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য দরকার সঠিক সমীক্ষা। রাষ্ট্রের হাতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার দায়িত্ব, ইত্যাদি থাকা উচিত। আর গরীবী দূরীকরণের সমস্ত টাকা সরাসরি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেতে পারে যথার্থ গরীবরা। যেমন পায় চাকরী জীবিরা মাসে মাসে। প্রত্যেক মানুষই বোধ হয় নিজের উন্নতির পরিকল্পনা অন্যের চেয়ে ভাল করতে পারে। প্রান্তিক চাষী বা ভূমিহীনদের নামমাত্র জমি দিলে তাদের সমস্যা কোনোদিনই মিটবে না। দরকার সেই পরিমান জমি যা থেকে তার উপার্জনের বেশী অংশ আসে। তা না হলে আবার ভূমিহীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

—এ অবাস্তব পরিকল্পনা রূপায়ন করা সম্ভব? এতক্ষণে বোর্ডের ভাবগতি পাল্টে গেছে। দরকার একটা ছুতোর, তা হলেই প্রার্থীকে বিদায় করা যায়।

—আমার মনে হয় সম্ভব। আর যদি না হয় তা হলে আপনিই বলুন স্যার। ধনী গরীবের ফারাক কিভাবে মিটবে। নীলার প্রত্যয়ী গলা।

কাঁথি ছাড়িয়ে গাড়ি পশ্চিম দিকে ছুটছে এগরা রোড় ধরে জুনপুটের দিকে। মেঠো হাওয়ায় ভাসছে আমার কদম সাদা চুল। মনের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা। হ্যাঁ নীলা জানে কাঠিসার আদিবাসী পরিবারগুলো কেন বুঁদ হয়ে থাকে হাঁড়িয়ার আদিম নেশায়। কেন ধনী আরও ধনী হয়। আর গরীব কেন চক্রবৃদ্ধিহারে গরীব হয়। কোন রহস্যে তাদের ঘরে একগাদা অপুষ্ট কাচ্চা বাচ্চা জন্মায়। নীলার কাছে হেরে যেতেই আনন্দ। তা হলে নীলার জন্যই কি এতদূর ছুটে আসা?

জুনপুট, রতিকান্ত। রতিকান্ত-জুনপুচ—মনের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে চোরা স্রোত। এই সেই হারানো সুর? কাল ইন্টারভিউ শেষে মনটা খচ্খচ্ করছিল মেয়েটার বায়োডাটা ভাল করে দেখার জন্য। বায়োডাটায় নীলা অনেক অর্থবহ, রেজাল্ট ভাল। মেয়েটার নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার মানসিক দৃঢ়তা আছে। কিন্তু বড় অ্যাডামেন্ট, হতে পারে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী। বোর্ড সদস্যদের অধিকাংশ একমত—এ রকম মেয়ে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার। কিন্তু এযে জুনপুটের কোনো এক রতিকান্তের মেয়ে। কে সেই রতিকান্ত, যার ঘরে এমন মেয়ে জন্মায়। না জেনে কিভাবে নিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই কি সেই জুনপুট? সেই রতিকান্ত? নীলা বাইশ বছর আগের ফ্রকপরা মেয়েটি? যে যুক্তির জালে আমাকে হারানোর ক্ষমতা রাখে। জানে পাট্টাপ্রাপ্ত প্রান্তিক চাষীরা কেন আবার হয়ে যায় ভূমিহীন। কেন ধনী দরিদ্রের ফারাক ঘোচে না। নীলা এখন আকাশ জোড়া বর্ণময় পাখি। বদ্ধঘরে দক্ষিনা হাওয়া।

মূল রাস্তা থেকে সরু মোরাম রাস্তার মাথায় রতিকান্তের বাড়ি। পুকুরপাড় হয়ে রতিকান্তের উঠোন। নারকেল গাছের ছায়ায় কালোজল। জলে মাছ খেলে বেড়ায়। উঠোনে গোলাপি পায়ে ঘুঘু পাখি। বাড়ি ঢুকতেই নীলার সাথে দেখা সামনাসামনি—

—একি আপনি?

—হ্যাঁ, চলে এলাম তোমাদের বাড়ি। অবাক হচ্ছ তো!

—অবাক হওয়ারই কথা। যতদূর শুনেছি বোর্ডের এজেন্টরা কখনও কখনও ক্যান্ডিডেটদের বাড়ি যোগাযোগ করে। রফা করার জন্য। লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। সরাসরি আপনি আসবেন ভাবতেই পারছি না। নীলার শরীরে ভাষা পাল্টে যাচ্ছে। নীলার মুখে ঘৃণা। এখন নীলা যেন শুধুই পাথর।

—আমাদের একটু বসতে বলবে তো।

—বসুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু টাকা পয়সা দিয়ে চাকরি পাওয়ার ইচ্ছা বা সামর্থ্য কোনটাই আমাদের নেই। আশা করছি আমাদের অবস্থান আপনাকে বোঝাতে পেরেছি।

—খুকি, কার সাথে ওভাবে কথা বলছিস। ঘরের মধ্য থেকে একজন বয়স্ক লোক বেরিয়ে এলেন। খালি গা, পরনে ধুতি। আমার সামনে বাইশ বছর আগের মুহূর্ত হেঁটে আসছে—

অ্যাক্সেলেটরে চাপ দিয়ে পালাচ্ছিল হাই পাঞ্জাব লড়িটা। পাত্তি দেখে বোঝা যাচ্ছিল হেভি ওভার লোডেড। রাস্তা ছেড়ে অনেকটাই মাটির রাস্তায় নেমে গেছে। মটর ভ্যাহিক্যাল ইনস্‌পেকটররা চেষ্টা করেছিল থামাবার, বিপদের আশঙ্কায় ছিটকে এসেছে দূরে। চাপা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, অথচ অনেক টাকা ফাইন করা যেত। ফিনানসিয়াল টার্গেট ফিলাপ করাই আমাদের ধ্যান জ্ঞান। এর সাথে জড়িয়ে আছে আমার ক্যারিয়ারের একটা সূক্ষ্ম সম্পর্ক। আগের মহকুমা শাসকরা সাধারণত এম. ভি. আইদের সাথে বেরুতেন না। আসানসোলে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত এ.আর.টি.ও. থাকে। সে-ই এদিকটা দেখে। যেহেতু সরকারকে বেশ মোটা অঙ্কের রেভিনিউ কালেকশন দিচ্ছি তাই আমার মনে একটা তৃপ্তিভাব কাজ করে। সরকারের কাছে আসানসোলের এস.ডি.ও. হিসাবে আমার একটা আলাদা গুরুত্ব থাকা উচিত, এমনটা আমার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে যায়। টার্গেট পূরণের তাগিদেই জিপ নিয়ে তাড়া করলাম লরিটিকে। ভাগ্য সহায়, বেশিদূর যেতে হলো না। রাস্তার ধারে গাছের ডালে আটকে গেল লরিটা।

অন-ডিউটি একজন কনস্টেবলকে বললাম—টেনে নামাও শালাকে। হারামজাদাটাকে পেদিয়ে বৃন্দাবন ছোটাব। আমার কথা শোনা মাত্র চুলের মুঠি ধরে নামিয়ে আনল ড্রাইভারকে। আসানসোলের হাড় কিপ্পন শীতের রাত। ড্রাইভার কাঁপছে। গলায় জড়ানো একটি মাত্র চাদর। আমার সামনে আসতেই লাগালাম কষিয়ে দুই থাপ্পড়। হঠাৎ একটা বাচ্চা মেয়ে কেঁদে উঠল। এদিক ওদিক কেউ নেই। এত রাত্রে হাইওয়েতে বাচ্চা আসবে কোত্থেকে। আবার কোঁকিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটা— আরে এ তো ড্রাইভারের চাদরের মধ্য থেকে কান্নার আওয়াজ। একজন পুলিশ এক টানে খুলে ফেলল তার চাদর। অবাক কান্ড, গলা আঁকড়ে রয়েছে আড়াই তিন বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে। গায়ে একটি মাত্র ফ্রক, দাঁতে দাঁতে ঠকঠকানি শব্দ। এতক্ষনে বোঝাগেল বেটা বাচ্চা চুরি করে পালাচ্ছিল। পুলিশ রামবাবুকে ড্রাইভারকে আটক করতে বললাম। রামবাবু তার মস্ত ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে অতি তৎপরতায় বেঁধে নিয়ে এলো তাকে। এ কাজটা ওরা ভালো পারে, ধরে নিয়ে আসতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে। আমার সামনে হাত জোড় করে কেঁদে ফেললো ড্রাইভার—না ছার, আমি চুরি করিনি। কচিটা আমার মেয়ে।

—ইয়ার্কি হচ্ছে? এত রাতে বাচ্চা মেয়ে নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছো। কিছু একটা অজুহাত দিলেই হল। লাঠি নিয়ে দু'ঘা লাগাতে গেলাম আবার। আমার পাশেই

নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল খালাসি। আচমকা সে আমার পা জড়িয়ে ধরল—মারবেন না ছার। কচিটা রতিদারই মাইয়া। বছর দেড়েক হল রতিদার বউ টাইফয়েডে মারা গেছে। বাড়িতে মাইয়াটাকে দেখার কেউ নেই। সেই থেকে মাইয়াটা আমাদের সাথে থাকে। লরির কেবিনই ওর বাড়িঘর। জানেন ছার, রতিদা আগে রাতে গাড়ির স্টিয়ারিং এ হাতই দিত না যতক্ষণ না নেশায় চুর হয়ে যেত। আর এখন, মেয়েটা গাড়িতে থাকলে ভুলেও একফোঁটা মদ ছোঁয় না।

আমার নিষ্ঠুর হাতের লাঠি পড়ে গেল। শূন্য দৃষ্টিতে রতিকান্তের উচ্চতা মাপছিলাম। রতিকান্ত তখনও বুকে আগলে রয়েছে ছোট্ট নীলাকে।

সেই রতিকান্ত ধীরপায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। ভুল হয়নি চিনতে। রতিকান্ত, রতিকান্ত, তুমি আর কোনোদিন কামদেব হলে না। স্বেচ্ছায় জয় করেছ সব। তুমি প্রান্তিক বলয়ে হাঁটা মানুষ। তোমার আছে নীলা। শুধু নীলা।

আমার গাড়ির অভিমুখ কলকাতার দিকে। নীল আকাশে পেঁজা পেঁজা মেঘ উড়ে যাচ্ছে দক্ষিনা হাওয়ায়। আমার ইচ্ছে হচ্ছে চলন্ত গাড়ির জানালায় মুখ বাড়িয়ে মেঘদূতের কাছে চিৎকার করে বার্তা পাঠাই—শুনুন কালাম সাহেব, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেয়ে কঠিন যুদ্ধ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ার একজন সৈনিক পেয়ে গেছি আমি।

সমন

—দিদি সমন এসেছিল।

—সমন! কি করলি?

—ক'টা টাকা গেল। পিয়নকে ম্যানেজ করেছি। লিখে দেবে, নট ট্রেসয়্যাবেল অ্যাট দিস অ্যাডড্রেস।

—সেই ছোট্টটি রয়েছিস। তুই কিনেছিস পিয়নকে আর ঐ ফেরিওয়ালাটা কিনবে গোটা অফিসটাকে। শীলা কথা বাড়ায় না। মাথার মধ্যে সমন শব্দটা ঘুরপাক খায়। অফিস ফেরত ব্যাগটা নামিয়ে চলে যায় ম্যাজেনাইন ফ্লোরে। তার শোওয়ার ঘর। আলো জ্বালাতে ইচ্ছা হয় না। গা এলিয়ে দেয় বিছানায়। অন্ধকারে বুক চেরা ফ্যানের শব্দ....শো-শো-শো-ও.....।

শীলাকে ডকে দাঁড় করিয়ে কি বলবে মৈনাক বসুর অ্যাডভোকেট?—মাইলর্ড, মাই ক্লাইন্ট কামস্ ফ্রম এ রেসপেকট্যাবেল ফ্যামিলি......বাট মিসেস শীলা মজুমদার হ্যাজ ডিসট্রয়েড হিম অ্যাণ্ড ডিসটার্বড হিজ ফ্যামিলি লাইফ। সি ইজ নাথিং বাট অ্যা পার্ভাটেড ক্যারেকটরলেস লেডি। কালো আস্তিনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্নবাণ। নগ্ন, জটিল। শীলার চোখের সামনে কালো কালো পোশাকের মানুষগুলো গোলক ধাঁধায় আইনের প্যাঁচ কষবে। কে কোন কালে উকিলদের কালো পোশাক প্রবর্তন করেছিল। ইতিহাস বড় হতে হতে কত গভীরে শিকড় ছড়িয়ে দেয়। শীলার মাথার মধ্যে জর্জ সাহেবের অর্ডার অর্ডার শব্দ ছাপিয়ে যায়—ক্যারেকটরলেস লেডি....।

শীলার দৃষ্টি মৈনাকের দিকে। ইচ্ছা হয় কোর্টের মধ্যে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে—মৈনাক বসু, আমাকে এ কাদায় কে নামিয়েছিল? হয়ত মৈনাক অন্তর্যামীর হাসি হাসবে। ও দর্শণটা ভালো বোঝে।

হার্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ মুখার্জীর চেম্বারে মৈনাকের সাথে শীলার প্রথম দেখা। সেদিন শীলার বাবার ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয়েছিল। লাইফ লাইন দেখে মৈনাক বলেছিল—স্যার, ভাসকুলার ক্যাভিটি সামান্য ডিফেকটিভ। তুমি কি করে বুঝলে—ডাঃ মুখার্জীর গম্ভীর গলা। —স্যার, আউট অফ এক্সপ্রিয়েন্স। এবং কথা প্রসঙ্গে শীলা আর তার বাবার সাথে পরিচয়। মৈনাক একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। সুদর্শন, স্মার্ট, বেশ গুছিয়ে কথা বলে।

যেমন মে[illegible] রিপ্রেজেনটেটিভরা হয় আরকি। প্রথম পরিচয়েই শীলাকে বলেছিল —আশা করি খুব শীঘ্রই তোমার সাথে দেখা হচ্ছে। শীলাকে তুমি বলায় রাগ হয়েছিল, তবে মৌন থেকে প্রশ্রয়ই দিয়েছিল। মেয়ে মন!

ঠিক পরদিনই বাস থেকে নামতেই কে যেন ডাকল—এই শীলা এদিকে চলে এসো। সে চমকে উঠেছিল, মৈনাক ডিপ সবুজ রং-এর মারুতি এস্টিম থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে।—চলে এসো। তোমাকে লিফট দেব বলে দাঁড়িয়ে আছি। —থ্যাঙ্ক ইয়ু। এই তো হেঁদুয়া। ঠিক চলে যাব। মৈনাক নাছোড়বান্দা। গাড়িতে উঠতেই সে বলেছিল—

—শোন অত পড়াশুনা করে হবে কি? সি, আই হ্যাভ নট ক্রসড কলেজ বার। অ্যাম আই নট্ এস্টাবলিষ্ট? কথাগুলো শুনে শীলার গা জ্বলে যায়—আহা আহ্লাদ কত? উনি ফেলুরাজ্জ ধিমান বলে অন্যের পড়াশুনার দরকার নেই। শীলা বলেছিল—ইয়ু আর বাই প্রোডাক্ট অফ অ্যা ওয়েল টুডু ফ্যামিলি। মৈনাক হো হো করে হেঁসেছিল। তবু গাড়ি চলছিল। শীলা তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে অর্থনীতির প্রথম বর্ষের ছাত্রী। অর্থনীতির লেকচারার হওয়ার স্বপ্ন। স্কুলে বরাবর প্রথম হয়েছে। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে স্টার পাওয়া ছাত্রী। মৈনাকের কথা শুনে গা ঘিনঘিন করে। অসহ্য এই মানুষটা।

মৈনাকের লিফট দেওয়ায় উৎপাত বাড়ে। একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল—তোমাদের মাস্টার মশাই কেমন লিখছেন?

—কার কথা বলছেন?

—আরে তোমাদের হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট—তরুণ সান্যাল।

—কেমন করে বলব। ক্লাসে তো উনি আর কবিতার কথা আলোচনা করেন না। কখনও কখনও গপ্পোচ্ছলে দাঙ্গেয়ান ইকোনোমিক্স বলে ফেলেন। তা..... আপনি ওঁকে চেনেন নাকি। আজকাল তো আধুনিক কবিতার লেখকের চাইতে পাঠক কম। লেখক ছাড়া তার কবিতার অন্য কেউ মানে বোঝে? শীলার কথায় ব্যঙ্গ।

—না, চিনি না, তবে ওঁর কবিতা পড়ি মাঝে মাঝে। আর কবিতার তুমি তো সরল সমীকরণ ঘটালে। শীলার ধারণা হয়েছিল তাকে ভোলানোর জন্য ফেরিওয়ালাটার ছল। ওদের ব্যবসায় তো অনেক ছলের দরকার হয়। ডাক্তার আর মেডিসিন সপগুলোর সামনে টোপ ফেলা। বোঝাপড়াটা দেওয়া নেওয়ায়। শুধু ডাক্তারকে বাজিয়ে নেওয়া কতটা খেলবে। নাম ও গুরুত্ব অনুসারে টিভি, ফ্রিজ এমনকি লিকুইড ক্যাশ। তারপর প্রেসক্রিপশন ভরে যাবে নামী দামী কোম্পানীর দামী ওষুধে। পাশের বাড়ির ভোলা জ্যেঠু নাকি এমনই দামী ওষুধের শিকার। কই কিছুই তো হল না। —ক্রেতা সুরক্ষা আইন্ আছে। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল-এর রিপোর্টই বেরুল না। কাক ক'টা কাকের মাংস খেয়েছে? ভাবনায়

ছেদ পড়ে মৈনাকের মন্ত্রমুগ্ধ গলায় তরুণ সান্যালের কবিতা—সকলেরই হাতের মুঠোয় থাকে / অথচ তা কেবা জানতে চায় / যেমন বালিকা কবে জানেনা যুবতী হয়ে ওঠে। জয় গোস্বামী থেকে একেবারে হাল আমলের কবিদের কবিতা। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ কিনা কিনে ফেলল একটা গোটা হৃদয়। নিভৃত কবিতার ভেলায় ভেসে যাওয়া। শীলার কাছে কবিতা এখন অর্থবহ, জীবনের কাছাকাছি।

শীলা জানত রেজাল্টটা এমনই হবে। কোনোক্রমে বি. এস. সি. পাশ করেছে। অনার্স কেটে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ। শীলার বাবাও অবাক হয়নি। শুধু বলেছিল—তুমি বড় হয়েছ। আমি জানি তুমিও জানো—কোথায় দাঁড়িয়েছ। তবু বলবো—ভবিষ্যতের কথা ভাব। ঝড় এলে সামলে নিতে পারবে।

মজুমদার বাড়িটার উপর দিয়ে চোরা স্রোতের মতো ঝড় বয়ে গেল। অথচ সেদিন তো আনন্দেরই দিন হওয়ার কথা ছিল। মনোতোষ বাবু রিটেয়ার করার পাঁচ বছর পর মেয়ে গিয়েছিল রেলের চাকুরীতে জয়েন করতে। কেরাণীর চাকুরী। অনেকগুলো পরীক্ষার পর নির্বাচিত হয়েছিল। যখন ফিরে এলো শীলা ভেঙেচুরে কুঁকড়ে গেছে। ভাঙ্গনটা শুরু হয়েছিল মাস দুই আগে। এক ঝলক রক্তপাত ভাসিয়ে দিতে পারত তার সব উৎকণ্ঠা। বীজের অঙ্কুরোদগম্। শীলা কোনোক্রমে ব্যাগটা নামিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। মা-বাবা-ভাই হতভম্ভ। ভাই শীলার ব্যাগ থেকে বের করল কাগজটা। মেডিকেল টেস্ট রিপোর্ট—টেম্পোরারিলি আনফিট ডিউ টু প্রেগনানসি। বাড়িটা বোবা হয়ে গেল।

মৈনাকের অ্যাডভোকেট বলছে—মাই লর্ড মিসেস শীলাকে আমার মক্কেল বহুবার নিজের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এভিডেন্স হিসাবে আমি এগুলো জমা দিচ্ছি। এগুলো আমার মক্কেল আণ্ডার সার্টিফিকেট অফ পোষ্টিং করেছে। অথচ এই মহিলা নিজের স্বামীর চাইতে পরপুরুষে আসক্ত। তাই হুজুর.....।

শীলা কানে হাত চাপা দেয়—হুজুর কালো কোট পরা মানুষগুলোকে কোর্ট থেকে বের করে দিন। ওদের নিঃশ্বাসে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। আর ওকে একবার দয়া করে ডকে দাঁড়াতে বলুন। —তুমি বলছ আমি চরিত্রহীন, পরপুরুষে আসক্ত। তোমার মনে পড়ে বাবার অকথিত আপত্তি সত্ত্বেও তুমি আমাদের বাড়িতে আসতে। তা একটু বেশীই আসতে। তোমার কবিতা 'তোমার দর্শন' আমায় কেমন সম্মোহিত করে রাখত। তুমি ঘোর চার্বাকী। পুরুষেরা কমবেশী চার্বাকপন্থী। সেটাই বোধ হয় তোমাদের মানায়। চার্বাক ও ইউরোপীয় দর্শনের মেল বন্ধ খোঁজাই ছিল তোমার নেশা। আর এখানেই আমার ছিল ভয়। তোমার দর্শনের চরম পরিণতি ভোগবাদ। আর এই অজুহাতেই তুমি আমাকে ডি-ফ্লাওয়ার্ড করলে। এই দিনটা কি আমি এমন ভাবে চেয়েছিলাম? আমার দেহে পুঁতে দিলে কলঙ্কের বীজ। বাবা তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। ফিরে আসার পর ডাঃ মুখার্জী

বলেছিলেন, মজুমদারবাবু সাবধানে থাকবেন। লাইফ লাইনটা মাঝে মাঝে ছেদ হয়ে যাচ্ছে। ততোদিনে তোমার দার্শনিক ভাব আরও বেড়েছে। তোমার দার্শনিকতায় যোগ হয়েছিল আমার প্রতি উদাসিনতা।

যেদিন তোমাদের বাড়ি গেলাম নতুন বউ হয়ে—বাড়ির সবার চোখের ভাষা পড়তে আমার ভুল হয়নি। আমি লজ্জায় জড়সড়। ব্যালকনি থেকে ভেসে এসেছিল—নীচু জাতের মেয়ে, আরো কত কি দেখবি।

শীলার বাবা বছর খানেক পরে তাকে নিয়ে গেছিল ফেয়ারলি প্যালেসে। বাবার বন্ধু রামপদ সিনহা সেকসন ইনচার্জ। তিনিই তদ্বির করে মেডিকেল রিটেষ্টের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। এবং যথারীতি টেষ্টে ফিট হল। পোষ্টিং হল শিয়ালদার ক্যাশ সেকশনে। তাদের কাজ একটু দেরী করেই হয়। ক্যাশ ট্রেনগুলো সাধারণত বারোটার পরে ঢুকতে শুরু করে। শীলার কাজ অ্যাকাউন্ট রাখা। বিপ্রদাস ব্যানার্জী জয়েনিং ডেটে ডেকে পাঠিয়েছিল। ব্যানার্জী সাহেব পার্সোনেল অফিসার। বিবি সাহেব হিসাবে তার পরিচয়। জেনারেল সেকশন থেকে প্রমোশন পেয়ে এসেছেন। মাঝ বয়সী, সুদর্শন চেহারা।

বিপ্রদাসবাবু বেশ মিশুকে। ভদ্রলোক কথাচ্ছলে শীলার পারিবারিক অনেক খোঁজ খবর নিলেন। শেষে বললেন—দেখ শীলা, তোমার মতো মেয়ের এখানে আসার কথা নয়। তবু এসেছ যখন একেই ভালবাসতে শেখ। কেরাণীর জীবন টেনে টেনে বড় করতে হয়। তুমি অ্যাকাউন্ট সেকশনে কাজ করবে। আমার বিশ্বাস, তুমি অ্যাকাউন্টের কাজটা ভাল পারবে। সেকশনে তো স্টাফ শর্টেজ নেই। কিন্তু কাজের লোক ক'টা? সবাই নেতা।

রথীন লাহিড়ী আর শিপ্রা ঘোষ ডানকুনি লাইনের ক্যাশ গোনে। সারাদিনে এটাই তাদের কাজ। এক জায়গায় আছে দশ-বারো বছর। শিপ্রা ঘোষের কমপেনসেশন গ্রাউণ্ডে চাকুরি। আর রথীনের ব্যাপারটা আলাদা। তাদের কয়েক জেনারেশনের রেলে চাকুরী। বংশে নাকি মাধ্যমিক পাশ করতে পারলেই রেলে চাকুরী বাঁধা। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড হওয়ায় একটু ঝামেলা হচ্ছে না তা নয়। তবু রথীনরা পাঁকাল মাছ। ফাঁকফোকর দিয়ে ঠিক গলে যাবেই। সরকারী প্রতিষ্ঠানে ওদের সংখ্যাই নাকি বেশী। শীলার সাথে প্রথমে ওদের ভাব ছিল দাদা গোছের। যেন রেলের সব আইন কানুন ওরা জানে। শীলাকে শিপ্রা বলেছিল—বুঝলি শীলা, ঘোড়ার পিছনে আর সাহেবদের সামনে কখনও যাবি না। দু'টোই বিপদজ্জনক। কিছু না জানলে আমাদের বলবি। সাহেব সুবোরদের কাছে গিয়ে লাভ নেই। দেখছিস না হালদার সাহেবকে, আমাদের ডি.পি.ও. কিচ্ছু জানে না। এস.সি. কোটায় চাকুরী। শীলার পদবী মজুমদার। কিছু পদবী থাকে যা ব্রাহ্মণ থেকে তপশীলিদেরও হতে পারে। শীলার পদবী আর চেহারা দেখে ওদের ধারণা হয়েছিল শীলা জেনারেল

কান্তের মেয়ে। কিন্তু কান্ত হলো আগুনের মতো। চাপা কিছুতেই থাকবে না। যেদিন ওরা জানল শীলা এস.সি. সম্বোধনাটা কেমন আমরা তোরায় পৌঁছাল। শীলা আজকাল রাস্তাঘাটে ফিসফিসানীটা বেশ টের পায়। কারা সোনার কাঠি মুখে দিয়ে জন্মেছে আর কাদের জন্য দেশটার এতো পতন। শীলার বুঝতে কষ্ট হয়— কুড়ি পচিশ শতাংশ এস.সি., এস.টি. যদি দেশের পতন ঘটাতে পারে তবে আশি শতাংশ উচ্চবর্ণ চাকুরীজীবী কেন দেশটাকে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিচ্ছে না?

অফিস কেমন করে জেনে গেল শীলা আর মৈনাক আলাদা থাকে। শাঁখা সিঁন্দুর সে তো শীলা এখনও বয়ে বেড়ায়। অনেক করেও ওগুলো বাদ দিতে পারেনি। মেয়েরা স্বামীর ঘর করতে পারে না পারলেও সতীত্বের চিহ্ন টেনে নিতে হয় সারাজীবন। শীলার আলাদা থাকার খবরে হিতাকাঙ্খীর সংখ্যা বেড়েছে। রথীনদার বন্ধু তপন দত্তর যাতায়াত অনেক বেড়ে গেল। রথীনদাই পরিচয় করিয়ে বলেছিল—এই যে তপনকে দেখছ না, শিয়ালদা সাউথ সেকশনের টি.টি.। ওর অনেক পয়সা। আমরা বেচারী সারাজীবন ক্যাশগুণেই গেলাম। তবে হ্যাঁ, ওর দিলটা সাচ্ছা, যেমন আয় তেমনি ব্যয়। মিশে দেখ, বুঝবে। টি.টি. শব্দটা শুনলেই শীলার অন্য একটা ছবি মনে পড়ে। বিশেষ করে শিয়ালদা সাউথ সেকশনের কথা। এত জনঅরণ্যের মধ্যেও শিল্পীহাত চলে যায় আসল লোকের কাছে। আর প্লাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাদের এজেন্ট। মূল দরদামটা ওরাই করে। সন্ধ্যায় বাটোয়া। এই তো সেদিন শিয়ালদায় ধুন্দুমার কাণ্ড। যাদবপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একদল ছাত্র প্রতিবাদ করায় টি.টি.রা দলবল বেঁধে আচ্ছা ধোলাই দিয়েছিল। একজন ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল। মারের চোটে ব্যাচারীর এক হাত ভেঙেছিল। পেপারে অনেক লেখালেখি।

শেষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। শিয়ালদহ টি.টি.-দের মুক্তাঞ্চল। শিপ্রা মাঝে মাঝে কেটে পড়ে। যাওয়ার আগে বলে—শীলা একটু দেখিস, পারলে ফিরব। সাধারণত সে আর সেদিন ফেরে না। সময়টা যে খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে শীলা টের পায়। শিপ্রা না থাকলেই তপন আসে—কি অ্যাতো কাজ? চল না বেড়িয়ে আসি। আলো আঁধারি ক্যাথরিনে খাওয়ার লোভ দেখায়। এটাই শীলার ভয়—পুরুষরা কেউ ব্যক্তিত্বের লোভ দেখায়। কেউ টাকার। আবার অনেকের চালটা একেবারে আলাদা—সারল্যের লোভ। তবে অনেক মেয়েও মাছ হতে চায়।

—তুমি নীরবে ওভাবে থেক না। তোমার অ্যাডভোকেট আমার আর বিবি সাহেবের ভাইজ্যাক বেড়ানোর ছবিটা মহামান্য আদালতে জমা দিয়েছে। নীল পাহাড়ের গায়ে আমাদের গ্রুপ ফটো। এটা নাকি আমার পরপুরুষে আসক্তির বড় প্রমাণ। তোমার মনে আছে, সেবার অফিস থেকে গ্রুপ ট্যুর করেছিলাম ভাইজ্যাকে।

তোমার জন্যও পাশ তুলেছিলাম। যাওয়ার আগের দিন তুমি বললে—তোমরা যাও। দিল্লীতে কনফারেন্স আছে। সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল মার্কেটিং ডিরেক্টর আসবে। তুমি সেদিন বিকালের ফ্লাইটে দিল্লী চলে গেলে। ভেবেছিলাম ট্যুরে আর একবার সম্পর্কটা জোড়া লাগানোর চেষ্টা করব। বিবি সাহেব আমার অনেক কথা জানতেন। তিনি বলেছিলেন—শীলা পাহাড়ের কাছে মন খারাপ করতে নেই। ওতো একাই আকাশ ছুঁয়ে আছে। আকাশ তুমিও ছোঁয়াতে। জীবনের দু'একটা মুহূর্তের জন্য তো মরাও যায়। তোমার খেয়াল হলে আমায় ডেকে নিয়ে যেতে ছাদে, আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে—তোমায় ভাসিয়েছি কলঙ্কের জলে, আমায় বৃষ্টি করে দাও। আমি তোমার বুকে হারিয়ে যেতাম। সেই তুমি আমার অ্যালবাম থেকে ঐ ছবিটা নিয়ে প্রমাণ করতে চাও আমি নষ্ট মেয়েছেলে। মেয়েরাই শুধু নষ্ট হয়!

মৈনাকরা থাকত দোতালার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে। বাড়ির ছোট ছেলের জন্য বরাদ্দ ঘর। ছোটরা বড় হলেও মা বাবার পক্ষপাতিত্বে ছোটই থেকে যায়। নীচের ঘরগুলো দাদার ব্যবসায় নির্দিষ্ট। একটা ঘরে শীলার যাওয়া বারণ। শীলার ধারণা ওখানে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে মৈনাক মাঝে মাঝে আসর বসায়। তরল পানীয়তে মৈনাক আসক্ত তা প্রথম পরিচয়েই সে জানে। ওসব নাকি পেশা, স্ট্যাটাস ইত্যাদির অংশ। সিঁড়ি ভাঙতে জানাটা তো আসল কথা। ঘরটাকে মৈনাক বলে অ্যান্টিচেম্বার। চেম্বার শব্দটাই যে কোনো মেয়েদের ভয় মিশ্রিত কৌতূহল জন্মায়। অ্যান্টিচেম্বার শব্দটা আরো ভারী। সে শুনেছে মন্ত্রীদের অ্যান্টিচেম্বার থাকে। সেখানে প্রয়োজনে কি সব গুরুগম্ভীর গোপন শলাপরামর্শ চলে। সেদিন কি মনে হল শীলার অ্যান্টিচেম্বার দেখার খুব ইচ্ছা হল। সন্ধ্যা গড়িয়েছে। আটমাসের ভারী শরীরটা নিয়ে নীচে গিয়েছিল শীলা। দরজা ভেজানো। ঠেলতেই তড়াক করে একটি নগ্ন মেয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। মৈনাক....। আর কিছু মনে নেই শীলার।

তিনদিন পর জ্ঞান ফিরল। ননস্টপ ব্লিডিং, তার উপর সিজার। বিকালে মৈনাকের বৌদি এসেছিল নার্সিংহোমে শীলাকে দেখতে। যাওয়ার আগে বলল—চলি ভাই, যা কাণ্ড দেখালে, যমে মানুষে টানাটানি। বসু বাড়ির টাকা আছে বেঁচে গেলে। শীলার সমস্ত শরীর ভেঙে কান্না আসতে চায়—কেন তোমরা আমাকে বাঁচালে?

তার জ্ঞান ফেরার পর নার্সই জানিয়েছিল—ছেলে হয়েছে। আণ্ডার ওয়েট। একটি বেসরকারী হাসপাতালের ইনফ্যান্ট ওয়ার্ডে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। শরীরের উষ্ণতা নেই একটুও। শীলার চোখ দিয়ে জল গড়ায়—তাপ পাবে কোথায়। ওতো আটমাস বরফের মধ্যে ঘুমিয়েছিল। কেউ চায়নি আসুক। শুধু নিজের রক্তে ওর শিকড় গেঁথে গেছে। উপড়ানো যায়নি।

শীলাকে নার্সিংহোম থেকে পাঠিয়ে দেয়া হল বাবার বাড়ী সোদপুরে। দশ দিন পর হাসপাতাল থেকে মৈনাকই নিয়ে এসেছিল রুদ্রকে। কাঁচের ইনকিউবেটারে। তুলোর মধ্যে প্রায় ডুবেছিল ছোট্ট শরীরটা। সঙ্গে এসেছিল অনেক ফুল আর রং বাহারী বেলুন। যাওয়ার বেলা মৈনাক বলেছিল—ওকে সংক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রেখ।

এক গেল, দেড় গেল, রুদ্রর মধ্যে স্বাভাবিক শিশুর কোনো লক্ষণ দেখা দিল না। আস্তে আস্তে দৈহিক অসঙ্গতিগুলো প্রকাশ পাচ্ছিল। পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডাঃ কুন্তল সেন বলেছিলেন--মিঃ মজুমদার, আমার মনে হচ্ছে মাইণ্ড সেরিব্রাল পালসি। ওর চিকিৎসা—শুশ্রুষা আর ভালবাসা। শীলা অবাক হয়নি, তার যন্ত্রণাগুলো একটু একটু করে নিজের শরীরে ধারণ করেছে ঐটুকু একটা শিশু। ও তো নীলাম্বর নয়।

শীলার বাবার পেয়ে বসেছিল অন্য নেশায়। রুদ্রকে স্বাভাবিক জীবন দেবেই। আজ ফিজিওথেরাপিষ্ট তো কাল স্পিচথেরাপিস্ট। রুদ্রর বয়স যখন আড়াই তখন একদিন রবিবার বিকালে মহিতোষবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল—জানিস শীলা, প্রাইভেটে হোমিওপ্যাথি কলেজে ভর্তি হয়ে এলাম।

—তুমি এই চৌষট্টি বছর বয়সে হোমিওপ্যাথি পড়বে? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি।

—নারে মা মাথা খারাপ হবে কেন। শুনেছি ওখানে ফিজিওলজিটা ভালো পড়ায়। শরীরটা জানতে চাই, বুঝতে চাই। দাদুভাইর রোগটা কোথায় বাসা বেঁধে আছে দেখতে চাই। সেই শুরু। রুদ্র আর হোমিওপ্যাথ। জীবনের টানাপোড়েনে দাদু নাতির লড়াই। মহিতোষবাবু ভাবেন জীবন হল জলের স্রোতে ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের মতো। যত ক্ষয় তত পাথরের মসৃণতা ও জলের বেগ বাড়ে। তারপর সবইতো জলপ্রপাত। ছেলেটাও কেমন দাদুর নেওটা হয়েছিল। দাদুকে চিনতে অসুবিধা হয় না। অন্যরা কোলে নিলে দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে তার মুখটা চেপে ধরে নাকের উপর। মুখ দিয়ে লালা ঝরে আর ম-ম-ম-অ করে। সারা শরীরে কাঁপুনি। রুদ্রর আক্রোশ। দাদুর বেলা অন্যরকম। তার চশমাটা নিজের চোখে পরার চেষ্টা করে প্রাণপণে। ইতিমধ্যে ভেঙেছে কয়েক জোড়া। কখনও পড়তে পারলে পিছন দিকে বেঁকে পড়ে হা করে দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রুদ্র কি বলতে চায়? বোবার কথা। দাদুর চশমায় কি সবাইকে চিনতে পারে?

মহামান্য আদালতকে তোমার উকিল বলেছে তুমি নাকি আমাকে বহুবার ফিরিয়ে আনতে গেছ। আমি আসিনি। হ্যাঁ, গেছ কয়েকবার। আমার শরীর তোমার প্রয়োজন হত মাঝে মাঝে। আর যে কথাগুলো বলতে তা জানি তুমি আদালতকে কোনোদিনই বলবে না। তুমি চেয়েছিলে ছোট্ট অসমর্থ রুদ্রকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিতে

বরাবরের জন্য। মোটা টাকা ডোনেশানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তোমার চাই একটা সবল বংশধর। যে তোমার রক্ত নিয়ে জন্মাবে, যার অ্যান্টিচেম্বার থাকবে।

বাবার কি আনন্দ, যেন বিশ্ব জয়। বুদ্র সেদিন টালমাটাল পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে। এমনই যোগ তুমি আমাদের বাড়ি এলে বিকালে। বাবা উচ্ছ্বাস চাপতে পারেনি—দেখ মৈনাক, দাদু ভাই কেমন হাঁটতে শিখেছে। তুমি ফিরেও তাকালে না। বললে—ওকে দেখে আমার কি লাভ। ওর কি বাপের ঠিক আছে? বাবার লাইফ লাইন স্টিল হয়ে গেল। আইনের চোখে তুমি নির্দোষ। এর পরেও জানি হুজুর আপনি ডিভোর্সের ব্যাপারে আমার মতামত চাইবেন।

বিকালের দিকে পিয়ন এসে বলল—দিদি, সাহেব ডাকছেন। অফিস প্রায় ফাঁকা। চেম্বারে ব্যানার্জী সাহেব একা। শীলার হাতে একটা লম্বা খাম দিলেন। পার্সোনাল চিঠি। রেজিষ্টার্ড। ভয়ে ভয়ে শীলা খুলেছিল। কিসের চিঠি? সমন—শীলা নোটিশটা ব্যানার্জী সাহেবের হাতে দেয়। মৈনাকের উকিল একটা কপি শীলার অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়েছে। ব্যানার্জী সাহেব সমবেদনার স্বরে বলেন—শীলা বাড়ি চলে যাও। ক'দিন ছুটির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে চিন্তা ভাবনা কর। এ সময় তোমার বাবা তোমাকে সাহায্য করতে পারতেন। আমাকে আপনজন ভাবতে পার। যদিও বাবার আসন কেউ নিতে পারে না।

আরে ঘরটায় আলো জ্বালাসনি। ভাই সুইচ অন করে দেয়। দিদি, বুদ্র রইল। বুদ্র টালমাটাল পায়ে ম-ম করতে করতে শীলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শীলা বুকের মধ্যে টেনে নেয় তাকে—তোকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব নারে বুদ্র। কোথাও না। শীলার চোখের কোন ভরে ওঠে জলে। বুদ্র এক নাগাড়ে ম-ম-ম-আঁ-আঁ-আঁ করে যাচ্ছে।

সারহুল পরবের রাতে

পিলচু হাড়াম কোনো দিন নিজেকে আদি মানুষ ভাবেনি। আদিম মানুষের বংশধর ভাবতে তার দ্বিধা নেই। যদিও বাদরের বংশধর ভাবতে তার ততোধিক আপত্তি। পিলচুর কাছে এটা পরিস্কার যে, বিবর্তনের কাহিনী যে বা যারা লিখেছে সে নিঃসন্দেহে জমসিম জানে না। আদিবাসী সৃষ্টিতত্ত্ব জানলে বরং বলত মানুষ হাঁসের বংশধর। তারা লিটা ঠাকুরের নামই জানে না তো হাঁসের ডিম থেকে আদি মানব-মানবী তৈরীর সৃষ্টি রহস্য জানবে কি করে। নিজেকে সে বরঞ্চ এ বলে সান্ত্বনা দেয় যে সে যদি আদি মান্‌ওয়া হয়, নিঃসন্দেহে আদি মান্‌মী থাকবে। গোটা বনজঙ্গল, ডুংরি, ঘুটু তন্ন তন্ন করেও আদি মান্‌মী পিলচু বুডহি'র দেখা মেলেনি। এই গন্ডগোলের সূত্রপাতের মূলে মকররাম টুডু। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার মশাই ক্লাসে একগাদা ছেলেমেয়ের সামনে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল—এই যে পিলচু হাড়াম আদি মান্‌ওয়া পড়াশুনায় মন লাই ক্যানে? ছেলেরা সুযোগটা লুফে নিয়েছিল। আড়ালে আবডালে আওয়াজ দিতে আরম্ভ করল—পিলচু হাড়াম, আদি মান্‌ওয়া। অথচ ভগন মুর্মু কি অতো সাতপাঁচ ভেবে ছাতিয়ার করেছিল। সে কি জমসিম্ জানত? ছেলের একটা নাম রাখতে হয় তাই রেখেছিল। আর যদি সৃষ্টিতত্ত্ব জানতই তবে ক্যানে যদুবংশীয় লোকদের বেগার খেটে মরল বাপটা। তেইশ বছরের জীবনে পিলচু হাড়াম হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে, দে আর যদুবংশীয় লোকজন কি চিজ। অরণ্য কেটেছে আর তার উপর থেকে অধিকার কেড়ে নিয়েছে আদিবাসীদের। এই মহাজনদের কেন বানাতে গেল লিটা ঠাকুর? কামিনগাই-র চুইয়ে পড়া দুধে মাটি ভিজে কাদায় কেন গড়তে গেল দে আর যদুবংশীয় মহাজনদের। তাদের গায়ের রং ছিল দুধ সাদা। সাদা চামড়ার মানুষগুলো আজন্ম সুবিধাভোগী। এবং ভোগবাদী। লিটা ঠাকুর কালো চামড়ার দেবতা হয়েও কেন এই সহজ সত্যটা বুঝল না। পিলচু হাড়ামের মগজে এঁটে ওঠে না ব্যাপারটা। এই সত্যটা বোঝে শুধু বিন্‌তী। শ্যামলা বরণ কন্যার পটলচেরা চোখের ভাষায় অনেক কথা লেখা হয়ে যায়। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। কিন্তু কন্যার তীক্ষ্ণ সরল চোখ তিরবিদ্ধ করে পিলচুর বুকে। খড়িডুংরি, বারোঘুটু, জামবেড়িয়া আর মুকুটমনিপুর জুড়ে নেচে ওঠে ঘুঙরু। চারপাশে ছোট ছোট টিলায় খুব একটা কালো পাথর দেখা যায় না। কিন্তু কিভাবে এলো কষ্টিপাথরে দেবীমুখ। পিলচুর মাথায় আসা সব প্রশ্ন গুলিয়ে

যায় বিন্‌তীকে দেখে। সাহস হয় না বিন্‌তীর সাথে কথা বলতে। তাই পাহাড় জঙ্গলের পাশ থেকে সে দেখে বিন্‌তীর চলে যাওয়া পথ। ঝরনার পাশ দিয়ে বিন্‌তী হাঁটলেই ঝরনার জল খিলখিলিয়ে ওঠে। পিলচু হাড়াম বোঝে না একটা অদৃশ্য সুতো তাকে টানে। আর তার অন্যদিকে ওত পেতে আছে একটা প্রেমের ফাঁদ। বিন্‌তীর একবার দেখা মিললে আকাশটা মনে হয় পেঁজা পেঁজা। অন্যদিনের মতো ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে ঘাপটি মেরে পিলচু দেখছিল বিন্‌তীর হেঁটে যাওয়া পথ। তারপর কি যে হল, বুঁদ হয়েছিল কতক্ষণ মানে নেই তার। কাঁধের উপর শক্ত হাতে চাপ পরতেই ঘোর ভাঙল পিলচুর। সাক্ষাৎ যমের মতো সামনে দাঁড়িয়ে জগ্‌মাঝি। জগ্‌মাঝির চোখ এড়ায় না পিলচুর প্রেমঘোর। জগ্‌মাঝি যুবক যুবতীদের অভিভাবক। সে-ই প্রথম জানতে পারে প্রেমিক-প্রেমিকার মনের কথা।

ঠাণ্ডা গলায় জগ্‌মাঝি বাঁকু হেমব্রম বলল—নিশীতেম আঁধায়েণ দম ঢিলাউ। পিলচু হাড়াম আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবল—চাঁদো বোঙ্গা, জীবন তুমি দিয়েছ। বিন্‌তীতে একথা লেখা আছে। মাথায় বিন্‌তী শব্দটা আসতেই আবার আচ্ছন্ন হয়ে গেল পিলচু হাড়াম। জগমাঝির রক্তচোখে তার ভ্রুক্ষেপ নেই।

গন্টুরামের বেটা দিশুরাম মুন্ডা সন্ধ্যা হতে না হতেই ঝুপার করল। ভড়ের মধ্যে মাঝে মধ্যে মাথা ঝাঁকিয়ে বিকট আওয়াজ করে বলে উঠছিল—মারাং বুরু! মারাং বুরু! জাহের এরা পাপ দ জগায়। মাদল ধামসার বাজনার শব্দ ছাপিয়ে যাচ্ছিল—মারাং বুরু! মারাং বুরু! দিশুরাম এত অল্প বয়সে সাক্ষাৎ মারাং বুরুর স্বপ্নাদেশ পেয়েছে। ভরের মধ্যে সে যেসব কথা বলে সব নাকি ফলে যায়। সবার মুখে মুখে দিশুরামের অলৌকিক সব কান্ড কাহিনীর জয়গান। গ্রামের মাঝিই প্রথম আখ্যা দিয়েছিল—জানগুরু। সমাজ বলল—ঠিক ঠিক। জানগুরুই বটে। সেই সন্ধ্যায় দিশুরাম শালগাছের নীচে তার ডেরায় ভড় করেছিল। শালগাছে ঝুলানো দু'টি সাগুন ঠিলি। মাটির কলসি দু'টির গায়ে ভেজা লাল সালু জড়ানো। শালগাছের গোড়ায় ডিম্বাকৃতি ছোট বড় বেশ কয়েকটি পাথরের বোল্‌ডার। পাথরের উপর বাহা। জবাফুলের লাল টুকটুকে পাপড়ি হাওয়ায় দুলছে। ধারে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে দু'একটি মোরগ। কক্ কক্ শব্দে কাঁপছে মোরগের লাল ঝুঁটি। ইতিমধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। অধিকাংশই রোগ ব্যধিতে ভোগা মানুষজন। সাধ্য মতো ভেট আনতে কসুর করেনি তারা। খনের চারপাশ ঘিরে তারা বসেছে। সোমালি সর্দার মেয়ের মানতে একটা টগবগে মোরগ জানগুরু দিশুরামের সামনে রেখে বলল—আবা, মুর বিটিটার কি হবেক। তার ছোট মেয়ের পেটটা ক্রমশঃ ফুলে যাচ্ছে। হাত পা কাঠি কাঠি কিন্তু পেটটা ক্রমেই ফুলে ঢোল। দিশুরাম ঝিম মেরে থাকল খানিকক্ষন, তারপর বিকট আওয়াজ করে উঠল—আদিগুরু মারাং বুরু ধরতি মম জাঁহার। তুমার বিটিকে ডান তুক করদি গেল। বিটিছেল্যা পড়হালেখা ডান।

উয়াকে তাড়াতে হবে বটেক। বাতাস দাঁড়িয়ে ছিল সন্ধিক্ষনে। আগুনের ফুলকি নিয়ে লাগালো গোল্লাছুট। টিলাপাহাড়, সোনাঝুড়ি, কেন্দু আর শাল-শিশুগাছের পাতা কেঁপে উঠল ধামসার গুড়ুগুড়ু আওয়াজে। ধামসা যেন বারবার গাইতে লাগল—ব্যাঙার কোচা। ব্যাঙার কোচা।

শলাপরামর্শ করার জন্য গোলটেবিলে নিমন্ত্রন। গ্রামের পাঁচ মোড়ল—মাঝি জগমাঝি, গোডেৎ, পাহান, নায়েক অন্ধকারে মাথাগুঁজে বসে গেল গভীর শলাপরামর্শে। লাসেদ টেগোয় মাঝির আসন সবার উপরে। বয়সও তার বেশী। অন্ধকারে হাঁটুর মধ্যে মাথাগুঁজে প্রায় দ হয়ে বসে আছে মাঝি। রাতের গভীরতা বাড়াতেই ডেকে উঠল ধূর্ত শিয়াল—হুক্কা হুয়া। হুক্কা হুয়া। সে ডাক মুকুটমনিপুর জলাধারের জল তরঙ্গে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ছিল অনেক দূরে। শলাপরামর্শ চলতে থাকে রাতের গভীরে।

বিন্‌তীর কথা। বিন্‌তী আদিবাসী সাঁরি ধরম-এর ধর্মগ্রন্থ। যেখানে লেখা আছে কারাম, জমসিম্, বাহা, ভানডান সম্মন্ধে। বাহা মানে ফুল। কিন্তু এই বিন্‌তী রক্ত মাংসের আদিবাসী মেয়ের নাম। বরঞ্চ বলা যেতে পারে বিন্‌তী একটি বাহা। যার রূপ আছে আর আছে সৌরভ। বিন্‌তী হাই স্কুলে জীবন বিজ্ঞান পড়ায়। ছেলে মেয়েদের শিখার বিবর্তনের রহস্য। লিটা ঠাকুরের সৃষ্ট হাঁসের ডিম থেকে পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়হি'র পৌরাণিক কাহিনী তাকে টানে না। ডারউইনকে বড় কাছের লোক মনে হয় তার। সোমলির মেয়েকে দেখে বিন্‌তী বলেছিল—মেয়েটার মনে হয় রিকেট হয়েছে। হাসপাতালে যাও ওকে নিয়ে। বুজরুকি, তুকতাক ছাড়। বিন্‌তীর কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। সামান্য এই কথাটায় যে যুদ্ধের ছায়া লুকিয়ে আছে ঘুনাক্ষরেও বিন্‌তী বুঝতে পারেনি। বারোঘুটু গ্রাম থেকে বিন্‌তী যখন সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যায়, পাঁচমোড়ল জুলুজুলু চোখে তাকিয়ে থাকে। ছোট্ট বিন্‌তীর মেধা নিয়ে আগে যখন আলোচনা হতো গোটা গ্রামের আদিবাসী সমাজে একটা গর্ব বোধ হতো। যদিও স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একটি আদিবাসী মেয়ের মেধা থাকতে পারে কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি। ভাবখানা এমন যেন সংরক্ষনের জোরে এগুচ্ছে। কিন্তু বরাবরই রেজাল্টের জোরে ছাপিয়ে গেছে অনেককে, অনেক প্রতিকূলতাকে। স্কুলের অন্য দিদিমনিরা আজকাল বলতে শুরু করেছে—তুই ভাই ভগবানের ভুলে আদিবাসী সমাজে জন্মেছিস। এমন মেধা আর দেবীমুখ আদিবাসী হতে পারে? বিন্‌তী চুপকরে থাকে। জানে যুক্তি বরাবরই সমষ্টির কাছে হেরে যায়। মনে মনে ভাবে—তোমরা আজন্ম অর্থনৈতিক আর সামাজিক সংরক্ষনের সুবিধাভোগী। তোমাদের মতো সুযোগ পেলে অনেক দূরে দৌড়াতে পারে সূর্যের সন্তানেরা। এ ব্যাপারে ডঃ আম্বেদকরের কথাটাই তার বেশী বলতে ইচ্ছা করে—বাল্মিকী, ব্যাসদেব, ডঃ আম্বেদকর কেউ তোমাদের

সমাজের লোক ছিল না। ডাকাত, জিয়নী এবং অচ্ছুৎ। অথচ তাঁরাই করল কিনা ভারতের সব চেয়ে বড় মেধার কাজগুলি। রামায়ণ, মহাভারত, ভারতের সংবিধান লিখতে এঁদেরই দরকার হলো? তোমাদের হাত থেকে একটাও বেরুল না। কোথায় ছিল তোমাদের মেধা, পাণ্ডিত্য? এই তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী মেয়েটির জন্য গর্ববোধ বেশীদিন গড়ায়নি পাঁচ মোড়লের। বিন্‌তীর মধ্যে তাদের অস্তিত্ব সংকট দেখতে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে। ছায়াযুদ্ধের একটা অদৃশ্যরেখা ছিল। কিন্তু মোড়লরা বুঝল দেরী হয়ে যাচ্ছে। কাঁটা তোলার এমন মওকা এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে পঞ্চমোড়ল আগে ভাবেনি। তবে ভেবেছিল শুধু জানগুরু। আর অবধারিত পাখির চোখ লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ। পড়হালেখা বিটিছেল্যা ডান খুঁজতে মোড়লদের বেগ পেতে হয়নি। বিন্‌তীর সমকক্ষ দ্বিতীয় লেখাপড়া জানা অন্য কেউ থাকলে না হয় একটা ভনিতার দরকার হতো। জগমাঝি যেহেতু যুবক-যুবতীর মুরব্বি। স্বাভাবিক ভাবেই পিলচু হাড়ামের দায় দায়িত্ব জগমাঝির উপরই ন্যস্ত। তবু একবার ঝালিয়ে নিল—পিলচু ছেল্যাটার কি হবেক? অন্য মোড়লরা একবাক্যে বলল—উহার ব্যাপার স্যাপার তোহার। ধুনা-নুচা করা। লয় মাইয়া ছেল্যাটা উয়াকে গিল্যে লিবে।

নিমু লায়েক এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বিন্‌তীর মনে হয় লিটা ঠাকুর কাপিলাগাই-র দুধে ভেজা কাদায় যাদের তৈরী করেছিল নিমু লায়েক তাদের বংশধর। অর্থাৎ যদুবংশীয়। বহুদিন বিন্‌তীকে উত্যক্ত করেছে কলেজের পথে, রাস্তাঘাটে। যদিও স্কুলে চাকরি পাওয়ার পর সরাসরি কুমতলব প্রকাশ করার সাহস দেখায়নি। কিন্তু লোকের মাধ্যমে প্রস্তাব দিয়েছে বিয়ের। উঁচু সমাজে তোলার স্বপ্ন। প্রতিবার ঘৃণায় ফিরিয়ে দিয়েছে সে প্রস্তাব। উৎকল বামুনের বখাটে ছেলের এই আদিম চালটা বিন্‌তী বুঝতে পারে। তার মনে হয় যা দু'একটা ভালছেলে মেয়ে বেরয়, তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সস্তা চাল আর কি। কিন্তু নিমু ইতিমধ্যে বুঝে গেছে—বিন্‌তী সাঁওতাল সমাজে চিহ্নিত ডাইন। গিরায় আওতায় এসে গেছে। অতএব ঝোঁপ বুঝে কোপ দেওয়ার এর চেয়ে আর উত্তম সময় হতে পারে? বিন্‌তীর স্কুলে যাওয়ার পথ আগলে দাঁড়ালো নিমু—আর ক'দিন মুখ ঘুরিয়ে থাকবে সুন্দরী। চাঁড়ে মুর বাড়ি চলো, বিয়া করা লিব।

বিন্‌তী ফোঁস করে উঠতে গেল কিন্তু নিজের অবস্থান তাকে মিঁইয়ে দিল। মিনমিনে গলায় বলল—পথ ছাড়।

—ক্যানে। মুরে পছন্দ লয়।

—বাদরকে আবার লোকে পছন্দ না করে পারে।

—খুব বড়াং। জোর করে সাঙ্গা করি লিব। নইলে তো মোড়লরা পোড়াইয়া মারবে। বিন্‌তী আর কথা বাড়াবার সাহস পায় না। সাইকেল ঘুরিয়ে জোরে প্যাডেল

মারতে থাকে উর্ধ্ব শ্বাসে। এই প্রথম মনে হল লিটা ঠাকুরই এর জন্য দায়ী। কেন সাদা চামড়ার মানুষদের বানাতে গেল। আর কেনই বা স্বর্গের স্বাদ দেখাতে গেল। স্বর্গে চামড়ার রং দেখিয়ে যারা অমৃত ভোগ করেছে তারাই তো চাইবে পৃথিবীর সব ভাল জিনিস ভোগ করতে। বিন্‌তী সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে আকাশের দিকে মুখ করে তাকাল—লিটা ঠাকুরের দেখা মিললে কৈফিয়ৎ চাইবে, কেন সিঞও বোঙ্গার সন্তানদের মাটিতে নিমু লায়েকদের সৃষ্টি করলে। কিন্তু কোথায় লিটা ঠাকুর। আকাশমনি গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। সারা শরীরে লেপ্টে গেল শাড়ী। শরীর ভিজল কিন্তু মন বিজল না। সাইকেলের চাকায় চিরচির করে ছিটে যাচ্ছে জল দু'দিকে। মনটা বড় খাঁ খাঁ করছে বৃষ্টি ভেজা শরীরেও। যে শিক্ষার জন্য জগৎটা চিনেছে, সেই শিক্ষাই কিনা ছোট করে দিচ্ছে জীবন বৃত্তটাকে। শুধু একটা মানুষ হয়ত এখনও তাকে বোঝে। পিলচু হাড়াম। অথচ মানুষটার সাহস নেই জগমাঝিদের উপেক্ষা করার। মানুষটা বর্শার দুরন্ত ফলার মতো ছুটতে পারে, পানকৌরির মতো ডুব সাঁতারে চলে যেতে পারে ড্যামের মাঝ বরাবর, মাথায় দেবদারু গাছের পাতার মুকুট পড়ে নেচে যেতে পারে সারারাত অথচ লোকটা শিশুদের মতো ভীরু। একদিন পাহাড়ি পথের আড়ালে হঠাৎ দেখা পিলচুকে বিন্‌তী বলেছিল—তুমি আদি মানব নও। তুমি বনের রাজা। পিলচু তখন এক ছুট্টে উড়ে যাওয়া ফুসমন্তর পাখি।

জগ্‌মাঝি পিলচুকে মুক্তির পে-রিত্‌ দিয়েছিল। এক বিঘা জমিতে একচাষে ফলাতে হবে কুড়ি মন ধান। মিটাতে হবে এক বছরের সারহুল পরবের যাবতীয় খরচ। তৃতীয় শর্তটি ছিল—ভূলে যেতে হবে ডাইনী বিন্‌তীকে। তিন শর্তের প্রথম দু'টিতে তার তেমন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তৃতীয় শর্তে প্রাণ কেঁদেছিল বৃষ্টির মতো। এবং সে বছর বৃষ্টি এসেছিল আকাশ ভেঙে। জল জমেছিল কংসাবতীর খালে চাষের প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী। বনের রাজার সারাদিন কাটে সবুজ ধানের সাথে বক্‌ বাকুম করে। কচি ধানের মাথায় হাওয়ার নাচন লেগে গেলে গাইত—চিয়াতেহঁয়া হো বির দিশম দ.....। রাত জেগে অন্ধকারে ডুবে থাকা মূর্তির মতো পাহারা দিত ধানক্ষেত। আলের ধারে পিলচু বসে থাকত চুপচাপ। কিছু দিন পর পিলচু বুঝেছিল তার রাতের অনেক বন্ধু আছে। সে একা নয়। তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে জোনাকি পোকারা আলোর ছবি আঁকে। জ্যোস্নারাতে বারোঘুটু পাহাড়টা নিঃশব্দে কাছিমের পিঠে বিবর্তিত হয়ে যায়। ছোপ ছাপ কচ্ছপের পিঠে ধারন করে আছে গোটা পৃথিবীটা। সেখানে কোথা থেকে যে নেমে আসে পরীর দল। সুন্দরী পরীদের কেউ ধবধবে ফর্সা নয়। কষ্টিপাথরের পরীদের প্রসারিত কালো পাখা। তারা নরম চঞ্চল পাখা মেলে নেচে নেচে গায় বাহা রেঃড়—সেরেঞ সাড়েকান দোরং দোরং ....। বড় অদ্ভুত মনে হয় পিলচুর—পরীরা নাচতে

নাচতে বিন্‌তী হয়ে যায়। কথা সুর যেন কত কালের চেনা। কচ্ছপের পিঠ দুলে ওঠে। দুলে ওঠে গোটা পৃথিবী। নিমিষে মিলিয়ে যায় পরীরা। তন্দ্রাভাব কেটে যায় পিলচুর। আকাশ তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। শান্ত পায়ে পিলচু হাঁটা লাগায় বাড়ির দিকে। ধান হয়েছে বিঘায় বাইশ মন। জেলার গড় সাড়ে তের মন। পিলচু হাড়ামের মুকুটে জুটে গেল একটি পালক, জেলার শ্রেষ্ট চাষীর তকমা। প্রথম শর্তে সফল পিলচু। দ্বিতীয় শর্ত পূরণের পালা। গোটা গ্রামের সারহুল পরবে খরচ দিয়েছে পিলচু। পুরানো মহুলগাছের নীচে সারহুলের দাত্‌কাম্‌ বুটা। সমর্পনের জায়গা। আনন্দের জায়গা। মেয়েরা এসেছে লাল পাড় সাদা শাড়ি আর মাথায় গুঁজে বাহারী ফুল। ছেলেদের ধুতি গেঞ্জি আর গলায় মাদল-ধামসা। গোটা গ্রাম ভেঙে পরেছে বসন্তোৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হতে। কিন্তু পিলচুর মনে আনন্দ নেই।

মাঝি, জগ্‌মাঝি, গোড়েৎ, পাহান, নায়েক গোল হয়ে বসেছে। মাঝে চক্‌চকে্‌ অ্যালুমিনিয়ামের হান্ডির হাড়ি। সবার মাথা খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে। নিমিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে হাঁড়িয়ার গ্লাস। মাঝি গোড়েৎকে উদ্দেশ্য করে বলল—বাড়েইতাৎ, সিং সাদম বেওয়া কোল কিদম। অন্যরা হেঁসে ফেটে পড়ল—বলে কিনা সিং সাদমকে খবর দিয়েছি কিনা। পাহান হাসতে হাসতে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল। মাদলের তালে তালে মেয়েরা কোমর দুলিয়ে নাচছিল আর গাইছিল—লগু মা বুবুরে সেরেঞ সাড়েকান দোরং দোরং.......। গান আর ধামসা-মাদলের শব্দ ছাপিয়ে উঠছিল অট্টহাসির রোল। অন্যরা হাসছে—তুমি বেটা বুড্ডা কিছুই জান না। দুষ্ট ঘোড়া সিং সাদমকে শুধু খবরই দেওয়া হয়নি, সে বেটা হয়ত ইতিমধ্যে ডাইনটাকে নিয়ে গেছে। ভাবখানা এমন দেখালেও কেউ নিমু লায়েকের নাম মুখে আনল না। সিং সাদম সাংকেতিক নাম ব্যবহারেই তাদের মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত হল। আনন্দের বন্যায় গোটা গ্রাম বুঁদ হয়ে গেলে নিমু লায়েক তার দলবল নিয়ে বিন্‌তীকে তুলে নিয়ে যাবে। এক ঢিলে অনেক পাখি মরবে। পাহান এক খাবলা রানুরান মিশিয়ে দেয় আর এক হাড়ি হান্ডিতে। মেয়েদের পা জড়িয়ে যাচ্ছে নেশায়। খাপছাড়া মাদল তখনও বাজছে—দুরাং দুরা। দুরাং দুরা.........।

দু'টি মানুষের চোখে ঘুম নেই। বিন্‌তী জানে এভাবে বুঁদ হয়ে যাওয়া রাতে আসে দুষ্ট ঘোড়া সিং সাদম। ছারখার করে দেয় সিঞ বোঙার পরিকল্পনা। সে ধরেই নিয়েছিল এমন একটি রাতকে বেছে নেবে মোড়লরা। সন্ধ্যার পরই তার পথ ছিল বারোঘুটু পাহাড়ের দিকে। পিলচু পাহাড়টার মাথায় বসে থাকে উদাসী হাওয়ায়। মনের দুঃখে বাঁশির কান্না ভাসিয়ে দেয় বাতাসে। আবার যন্ত্রনা যখন গভীর হয় তখন ডুব সাঁতারে চলে যায় অতল জলের নিচে পাতাল পুরিতে। মনের কথা বলে কচি ধানের শীষের সাথে। লম্বাচুলের পিলচুকে বিন্‌তীর মনে

হয় কবি। হয়ত পাথরের গায়ে এঁকে দেয় বেদনার কবিতা। ছায়ামূর্তির মতো বিন্‌তীকে দেখে পিলচু চমকে ওঠে। গা ঘেঁষে বসে বিন্‌তী। এই প্রথম দু'জনে দু'জনার এতো কাছে আসা। পিলচু অনুভব করে পুরো বন্য পাহাড়টা মিষ্টি গন্ধে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু তার মুখে কোনো কথা এলো না। মুগ্ধ মুক বসন্ত।

সামনে ব্যারেজের নিয়ন আলো নাচছে। কংসাবতী আর কুমারীর সংগমস্থলে জলতরঙ্গ। কংসাবতী আর কুমারী দু'টি নদী। তাদের সমকামিতায় আনন্দমুখর রাতে মুকুটমনিপুর ব্যারেজ যেন এক মায়াবীরেখা। বিন্‌তী পিলচু হাড়ামের পাথরের উপর রাখা ডান হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল— "দেবন তেঁগোন আদিবাসী বীর দ।" উঠে দাঁড়াও আদিবাসী বীর। পিলচু হাড়ামের চোখের সামনে বিশাল জলাশয়ের ছবিটা বদলে যাচ্ছে। এই তো সেই জলরাশি যেখানে লিটা ঠাকুর হাঁস হাঁসুলী তৈরী করেছিল। হাঁসুলীর পেটে ডিম, ডিমের খোলের মধ্যে আদিম মানুষ। পিলচু হাড়ামের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকে উত্তেজনা—আদিবাসী বীর উঠে দাঁড়াও। ডিমের খোলে লুকানো স্বপ্ন, তাকে বাঁচাতেই হবে সিং সাদমের হাত থেকে। জাহের এরা'র প্রথম দেখা মিষ্টি জলের জলাধারকে। আর বিন্‌তীর ধারণ করা বন, জঙ্গল এবং বিশ্বাসকে। পিলচুর সমস্ত সত্তার মধ্যে টগবগ করে ওঠে আদিবাসী যোদ্ধার রক্ত। চকচকে বর্শা হাতে তাড়া করে সিং সাদমের পিছনে। তির বেগে ছুটে চলা সাদা ঘোড়ায় বিন্‌তী দু'হাতে পিছন থেকে জাপটে ধরে রয়েছে পিলচুকে। বনোজ্যোৎস্নায় ভাসছে বিন্‌তীর ওড়া চুল। মুগ্ধ ঝরনার পাশ দিয়ে তির বেগে ছোটা ঘোড়ার পিঠ থেকে বিন্‌তী ঝরনাকে উদ্দেশ্য করে বলল—লড়াই শেষে তোমার সাথে কথা হবে অনুক্ষণ।

শুভ লাভ অথবা একটি ফাঁদের গল্প

মনু এসেছিল মেপে মেপে ঠিক এক দু'বছরের মাথায়। নিঃশব্দে অগোচরে। অথচ তার অদৃশ্য উপস্থিতি চিত্রালি টের পেত প্রতিনিয়ত। না দেখা মানুষটির একটা অবায়ব মূর্তি সে আঁকতে চেয়েছিল গত ছ'মাস ধরে। কিন্তু কোনো ভাবেই মূর্ত হয়ে ওঠেনি চিত্রালির কাল্পনিক মনু। এইতো সেদিন গনেশ কাকার মুখে বসে গেল মনুর মুখ। কাকা শশুব গনেশকাকা কোনোদিন মনুসংহিতা পড়েছে বলে শোনেনি চিত্রালি। গনেশকাকা কোর্টের কাজে বর্ধমান এসেছিল। গ্রামে ফিরে যাওয়ার পথে চিত্রালিদের বাড়ি এসেছিল দেখা সাক্ষাৎ করে যেতে। বসলেন, চা খেতে খেতে বললেন—স্বামীর যত্ন আত্তি ঠিক ঠাক কর তো। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা স্বামীর অধীন হয়ে যায়। গনেশকাকা নতুন কিছু বলেনি। চিত্রালির গনেশ কাকাকে মনুর মতো মনে হল। পাকা সাদা ঝাঁকড়া চুল, টিটলো নাক, লম্বা গড়ন। বুলাদির সাবধান বানী প্রথম প্রথম শুনতে ভাল লাগত। অথচ বুলাদি একদিন হাসতে হাসতে বলল—ঘর আর কতদিন ফাঁকা রাখবে চিত্রা? বাবা-মা'র কথা এবার একটু ভাবো। একটা নাতি পেলে ওঁরা কত খুশি হবে বোঝ? বুলাদি বোধ হয় জরায়ুর নিস্ফল কান্নার আঁচ পেয়েছে। কৃত্তিম বাঁধন ছাড়া মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রী তো উদ্দাম হয় তারা।

তবু যে কেন ঘাপটি বাঁধে না জীবন পোকা। এখন চিত্রালি স্পষ্ট দেখতে পায় মনুর মুখ বুলাদির মুখে কোন পার্থক্য নেই। শ্বেতবস্ত্রে লম্বা চুলে ঋষি দর্শন মানুষটিকে। খানিকটা তালগোল পাকাতে শুরু করে চিত্রালির ভাবনা। নারী পুরুষের শারীরিক ব্যবধান ঘুচে গেল? বুলাদিকে বড় দার্শনিক মনে হয় চিত্রালির। বুঝলি বউ, স্বামীকে শুধু শরীর দিলেই হয় না। সন্তান ধারণে অক্ষম মেয়েদের সংসারে ঠাই নেই। অবিবাহিতা ননদের কথায় শরীরের তৃপ্ত অনুভূতিগুলি এক নিমিষে উধাও হয়ে যায়। চিত্রালি অনুভব করে কম্পন এলে হাড়েই প্রথম আসে।

রঞ্জনের কথা। রঞ্জন চিত্রালির স্বামী। স্থানীয় কলেজে ইংরাজী সাহিত্য পড়ায়। বর্ধমানের শহরতলির নীলপুরে তাদের বাড়ি। জায়গাটা ঠিক শহর গ্রামের সীমানায়। ওপারেই খাঁটি গ্রাম। মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে দুরন্ত জাতীয় সড়ক। যৌথ উদ্যোগে তৈরী হয়েছে বাড়িটা। বাবার খনিক অবদান আছে। বাকীটা রঞ্জনের টাকায়। বুলা, চিত্রালি আর রঞ্জনকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। বাবা-মা'র খুব একটা আসা হয় না।

চাষাবাদের ফাঁকে কয়েক দিনের অবসর। কয়েকদিনের জন্য ছেলের বাড়ি এলেও দু'তিন দিনের মধ্যে হাঁপিয়ে যায় তারা। জাতীয় সড়কের গুমগুম আওয়াজে রঞ্জনের বাবার মাথা ধরে যায়। শেষে গ্রামে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। এরকম রঞ্জনের বাড়িতে চিত্রালির বিয়ে হয়েছে। মেয়েরা যা যা চায় সবই আছে এখানে। সব কিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল রঞ্জনের ভালবাসা আর ব্যক্তিত্ব। প্রথম চমকটা অবশ্যই ছিল পণ না নেওয়া। রঞ্জনের মতো আগরী পাত্রেব জন্য যে কোনো বাবা পঞ্চাশ ভরি সোনা সঙ্গে অনুসঙ্গ দিতে পিছপা হতো না। এটা হল এমন যোগ্য পাত্রের নিম্নতম বাজার মূল্য। পাশের জেলার উৎকল পাত্রের দামটা একটু বেশী। হাইস্কুলের মাস্টার হলেই কমপক্ষে নয় লক্ষ। এরপরেও পাত্র নিলামে উঠতে পারে। চিত্রালি বোঝে এসবের মানে। চিত্রালি পরে জেনেছে—রঞ্জনই তার বাবাকে এমন ওয়াক ওভার দিয়েছে। যদিও রঞ্জনকে লড়তে হয়েছে অনেক। বাবা-মা আর স্রোতের বিরুদ্ধে। বাজারে রটে গিয়েছিল—পাত্রের খুঁত আছে তাই পণ নেয়নি। চিত্রালির গায়ে কাঁটা দেয় এখনও। তার বাবার স্থাবর অস্থাবর সব কিছুর বিনিময়ে এমন পাত্র মিলত? সেই রঞ্জনে না ভেসে পারা যায়! শরীরের রোমে রোমে সে পুঁতে দিয়েছে তৃপ্তির স্বাদ। বাথরুমে সাওয়ারের নিচে নগ্ন শরীরে ভেসে যায় চিত্রালি। স্তন উরুসন্ধি বেয়ে গায়ের উত্তাপ মাখা ঝরনার জল গড়ায়। কত বার যে নিজের নগ্ন শরীরকে ভেনাস মনে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শরীরে উত্তাপ আর মাখামাখি এখন শিথিল হয়ে এসেছে। স্পষ্টই জরায়ুর কান্না শুনতে পায় চিত্রালি —জারিত কর শুক্রানু। দেড় বছরের মাথায় রঞ্জনের কথায় তাগিদ শুনতে পায় চিত্রালি—আহা, ঘরে একটা ফুটফুটে বাচ্চা থাকলে কি মজাটাই না হতো। রেডিও টিভির বুলাদিকে আর ভাললাগে না চিত্রালির। কে শুনতে চায় বুলাদির জ্ঞানের কথা। বরং ভাবতে ভাললাগে সেই ছবিটা—অসংখ্য লেজওয়ালা ব্যাঙাচির মতো শুক্রানু পিলপিল করে ছুটেছে জরায়ুর দিকে। কে পৌঁছাতে পারে সবার আগে। ডিম্বানুর শরীর ভেদ করে লেজ নেড়ে বলবে—ইউরেকা আমি এসেছি। শরীরে একটা গভীর অনুভূতি পেয়ে বসবে অনুরণনের মতো। কিন্তু প্রতি মাসে এক ঝলক রক্তপাতে পাল্টে দিচ্ছিল কল্পনার ছবিটা।

ইদানিং রঞ্জনকে বড় ক্লান্ত মনে হয় চিত্রালির। কৃষ্ণসায়রের মেলা থেকে রঞ্জন মস্তবড় একটা বাঁধানো শিবের ছবি কিনেছে। চিত্রালি তো হেঁসে খুন। যার ত্রিনাথ সেক্সপিয়ার সে কিনা কিনেছে নন্দী-ভৃঙ্গির গুরুকে। অট টুডু অর নট টু ডু-তে ভোগা রঞ্জনকে আগে কখনও দেখেনি সে। এবং আধারিত ভাবে সেক্সপিয়ার হেরে গেলেন ভোম ভোলানাথ শিবের কাছে। শিব সেক্সপিয়ারের ছবির জায়গা দখল করল। স্বয়ং শিব চিত্রালির দিকে তাকিয়ে। গোটা দুনিয়ার সাথে সাথে সমস্বরে ফিসফিসিয়ে উঠল—ও মেয়ে, তুমি বাঁজা?

চিত্রালি রঞ্জনের দিকে তাকাল অভিমানি চোখে—রঞ্জন, তুমি একবার অন্তত বোঝার চেষ্টা কর, বাচ্চা হওয়া না হওয়াটাই জীবনের সব কথা নয়। কে শোনে কার কথা, নির্বিবাদি মনু গাছের মগডালে কষ্টা পেয়ারা চিবিয়ে যাচ্ছে। রঞ্জনের মুখে দার্শনিক ছোঁয়া। বড় অদ্ভুত মনে হয় চিত্রালির, হিন্দুরা দার্শনিক হলেই মনু হয়ে যায় ভিতরে বাইরে।

দুই

মাল্টিপ্লেক্স বলাই ভাল। ডাঃ কুন্তল চ্যাটার্জীর নার্সিং হোম কাম চেম্বার কাম ল্যাব কাম পলিক্লিনিক্। সাথে যথারীতি ঔষধের দোকান। এখানে চিত্রালি প্রথম এলো। কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকতেই প্রাণ জুরানো ঠান্ডা। হলঘর ভর্তি একঝাঁক মহিলার কৌতুহলী চোখের ফ্লাসগান গিয়ে পড়ল চিত্রালির মুখে। রিসেপসন থেকে তাকে দেখিয়ে দেওয়া হল তিন নম্বর ঘর। বোলতার চাকের মতো বনবন করছে ঘরভর্তি মহিলাদের গুঞ্জন। অনেকের সাথে পুরুষ সঙ্গীও আছে। চিত্রালির নম্বর আসতেই সিস্টার গাকগাক করে জিজ্ঞেস করল—নাম বলুন। বিয়ে ক'দিন হয়েছে? বিয়ে হলে জৈবিক নিয়মেই বাচ্চা হওয়ার কথা। না আসা মানেই সমস্যা গোপনে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে একটা মেয়েকে। সেই গভীরতম গোপন জরায়ুর অনুভূতি এমন সর্বসমক্ষে আলোচনা? চিত্রালি থতমত খেয়ে গেল। সিস্টার ধমকে উঠল—আরে চুপ করে রইলেন কেন। এখানে যখন এসে পড়েছ, স্যার তোমার কোলে বাচ্চা এনে দেবেনই। কত জটিল কেস নস্যি করে দিলেন। সাক্ষাৎ ভগবান বুঝলে, ভগবান। চুপ করে থাকলে হবে, সমস্যা কি?

না, না আমি আর যাব না ওখানে। কেন বলবে তো। না, আমি যাব না কিছুতেই ডাঃ চ্যাটার্জীর নার্সিং হোমে। চিত্রা, কারণটা বলবে তো। কেন ওরা তোমার সাথে অশালীন আচরণ করেছে। অশালীন শব্দটা কট করে চিত্রার কানে বিঁধল। শালীনতা আর অশালীনতার একটা সীমারেখা হয়ত আছে। কিন্তু স্বেচ্ছা নির্বাসিত লজ্জা সরম কোন সীমানায় দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে না চিত্রালি। তার কানে বেজে ওঠে সিস্টারের ধমক—দাঁড়িয়ে রইলে কেন। সালোয়ার-কামিজ খুলে নয় নম্বর বেডে শুয়ে পড়। শুধুমাত্র নয় নম্বর ছিটটা সদ্য খালি হলো। যন্ত্রের মতো সবাই বুক পর্যন্ত সাদা চাদর টেনে শুয়ে পড়ছে। নার্স, টেকনিসিয়ান পুরুষদের সামনে বে-আব্রু শরীর। টেকনিসিয়ান অবিকল পুরুষাঙ্গাকৃতি একটি যন্ত্র ঢুকিয়ে দিচ্ছে যোনীপথে। আঃ কি যন্ত্রনা। কঁকিয়ে উঠেছিল চিত্রালি। ডাঃ চ্যাটার্জী পাশে দাঁড়িয়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির স্ক্রিন দেখছিলেন কোথায় লুকিয়ে আছে শরীরের অসম্পূর্ণতা। তিনি যন্ত্রনা কাতর গোঙরানিতে বিরক্ত হলেন। নার্স যেন এমনটিই চাইছিলেন—আরে এতো নড়াচড়া করে আদিখ্যেতা করছ কেন। স্থির থাকো নইলে

কিন্তু যন্ত্র খুলে নেব। চিত্রালি বেডের দু'পাশ শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে কাঠ হয়ে গেল। ডাক্তার কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে বললেন—প্লিজ বি রিলাক্সড। বডি নরম করুন। চিত্রালি আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে না। লজ্জা, ব্যথা আর কান্নায় অনেক আগেই তো চাখ-কান বুজে এসেছে। তার দেখার ক্ষমতা নেই—স্ক্রিনে ডিফেকটিভ ফ্যালোপিয়ান টিউবের ছবি। চঞ্চল শুক্রানুর নিষিক্ত না হতে পারার প্রাচীর। ডাক্তার বাবুর ব্যবস্থাপত্র—ছোট্ট একটি অপারেশনে মুক্ত হবে নিষিক্ত ডিম্বানুর ওমঘর। অথচ রঞ্জনকে কিছুতেই বুঝাতে পারছে না—হাত বাড়ালেই কত শিশু। অনাদর অবহেলায় বিড়াল-কুকুরের সাথে খাবার ভাগ করে খায়। ঔষধ আর ছুরি কাচি দিয়ে জবরদস্তি করে মা হওয়ার আনন্দ কোথায়। রঞ্জন এখানে আদিম পুরুষ। সে ইদানিং জিন ও রক্তের অবিমিশ্রতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। চাই নিজের রক্তের সন্তান। চিত্রালি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে—আমি আর সহ্য করতে পারছি না এই শালিনতার অত্যাচার। রঞ্জন অবাক হয়ে বলল—চিত্রা, দিস ইজ পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট। হোয়াই ডু ইউ টেক ইট আদার ওয়াইজ। বি সিরিয়াস।

ডাঃ চ্যাটার্জী সাকসেসফুললি অপারেশন করে ওভারিতে একটি পথ করে দিলেন। হ্যাঁ, প্যাসেজ টু ওভারি। এখন নিয়ম করে সন্তান উৎপাদনের অত্যাচার সহ্য করে যেতে হয় প্রতিরাতে। কিন্তু প্রতিবারই ঝলক ঝলক রক্তপাতে ঘোষিত হয় জরায়ুর ব্যর্থতা। বাড়ে ঔষধ-ইনজেকসনের মাত্রা। শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। কিন্তু যে শরীরের ধারণ ক্ষমতাই নেই তাকে সিরিঞ্জে ফুঁড়ে ফুঁড়ে আর কতটা ক্ষমতা দেওয়া যায়? শেষে ডাক্তারবাবু রঞ্জনকে ডেকে বললেন—ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেসান করলে সমস্যার সমাধান হবে। রঞ্জনের মাথায় এর কোনো মানে দাঁড়ালো না। কিন্তু সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে গেল এক নাগাড়ে। ডাক্তারবাবু জ্ঞান থাকা রক্তমাংসের শরীরে পেরেক পোঁতার মতো ঠুকে ঠুকে যন্ত্র ঢুকিয়ে দিলেন। সিরিঞ্জের মাধ্যমে প্রসেসড সিমেন সরাসরি জরায়ুতে ঢেলে দিলেন। চিত্রালির চারপাশ ঘন অন্ধকার হয়ে এলো। কিন্তু নড়াচড়া যাবে না। এমন কি কষ্টে কাতরানোও যাবে না। তা হলে বানচাল হয়ে যেতে পারে সব প্রচেষ্টা।

চিত্রালির পরীক্ষা। শরীরের অনুভূতি বলে দিচ্ছে জরায়ুতে কেউ ঘাপটি মেরেছে। প্রেগ কালার কার্ডে ধরা পরেছে মা হওয়ার যান্ত্রিক লড়াইয়ে সে পাশ করেছে। চিত্রালির একটা ভয় যে কাজ করেনি তা নয়। অন্যের চেহারার অভিব্যক্তি থেকেই তার ভয়ের জন্ম। বাথরুম থেকে বিবর্ণমুখে যারা বেরয় তাদের দেখেই চিত্রালি এখন বুঝতে পারে কৈ পাশ করেছে, কে ফেল করেছে। দলা পাকানো কান্না গিলতে গিলতে তারা নার্সিং হোম ছাড়ে। মেয়েরা আরো চুপসে যায় নিজেদের মধ্যে। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে মনু। মনু ফিস্‌ফিসিয়ে বলে—এবারেও পারলে না!

কিন্তু চিত্রালি মা হয়ে বুঝিয়ে দিল, মা হওয়া নয় মুখের কথা।

তিন

অভি এলো। তকে আনার প্রতিটি মুহূর্তকে প্রচুর মূল্য দিয়ে কিনতে হয়েছে রঞ্জনকে। এতো খরচের পর নিজেকে শূণ্য মনে হয়েছিল। যদিও অমূল্য অভি এসেছে ঘরে। রঞ্জনের বাবা লুফে নিয়েছিল নাতিকে। উচ্ছল বৃদ্ধই প্রথমে রঞ্জনের ছেলেকে অভি বলে ডেকেছিল। রাজত্ব থাকলে প্রথম দিনেই হয়ত অভির অভিষেক হতো রাজত্বে। বাবা কেন তাকে অভি নামে ডেকেছিল তার ব্যাখ্যা ছিল না। হয়ত অভিষেক ঐর্শ্বয্যের বাজারে বৃদ্ধ দাদুর মনে একটা প্রভাব পড়েছিল। বাবা হওয়ার আনন্দের পাশাপাশি রঞ্জনের খরচের অংকটা মাথার মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করছিল। বাবা তাকে ধমকে বলেছিল—আমি কি মরে গেছি নাকি। দাদুর জন্য আমার চল্লিশ বিঘা জমির আয়েও চলবে না? বর্ধমানে পাঁচ বিঘা জমি থাকলে যেখানে সংসার চলে যায়। সত্যিই তো রঞ্জনের চাকুরি আর বাবার সোনার গোলা জমিতে সংসারের স্বাচ্ছন্দ না থাকার কথা নয়। রঞ্জনের নিজেকে বোকা আর অপরাধী মনে হয়েছিল। ছোট্ট, অভি'র জন্য বিশ্বসংসার বাজি রাখা যায়। তার কচি কোচকানো নরম নরম হাত আর দুধে আলতা ঠোঁট সঞ্চারিত করেছিল রঞ্জনের মধ্যে পিতৃত্বের প্রথম শিহরণ। জঠরের গন্ধ মাখানো তলতুলে শরীরে স্পন্দন ভুলিয়ে দিয়েছিল রঞ্জনের খরচের খচ্‌খচানি। কি এক আশ্চর্য সুখানুভূতি আচ্ছন্ন করছিল তার সত্তাকে। অনুভূতিগুলি তার পুঞ্জীভূত হচ্ছিল দেহ মনে।

জন্মের ষষ্ঠ দিনে অভি'র সারা শরীর নীল হয়ে গেল। সুখানুভূতি হল কর্পূরের মতো উদ্বায়ী। কোনার বাড়ির প্রতিটি সদস্য ইতিমধ্যে বুঝে গেছে অভি'র কষ্ট হচ্ছে। ষষ্ঠীর দিনে অভি হয়ে উঠত অভিষেক, অভিনব, অভিলাশ অথবা প্রমেথিউস। রঞ্জন চেয়েছিল একটা জুৎসই গ্রীক নাম। বীর হয়ে ওঠার আগেই অভি'র ছোট্ট শরীর নীল হয়ে যেতে শুরু করেছিল। অভি'র ঠিকানা হাসপাতাল।

মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালের শিশু বিভাগে ঠাঁই পেয়েছে অভি। পুঁতি গন্ধময় পরিবেশ আর হাসপাতাল চত্বরে আস্তানাগাড়া একপাল কুকুরের চিল চিৎকারের মধ্যে অসহায় অভি শুয়ে আছে ইনটেনসিভ কেয়াবে। মাস্ক মুখে নলের মধ্যদিয়ে তিলতিল করে অক্সিজেন জোগাচ্ছে জীবনীশক্তি। শিশু বিভাগে উপচে পড়া ভীড়। অধিকাংশের বেড জোটেনি। মায়ের কোলে অথবা মেঝেয় শুয়ে তারা। রঞ্জনের বাবাই প্রথম হুংকার ছাড়ল—এখানে মানুষ বাঁচে। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামল দাস, চিত্রালির বাবা। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি বেয়াই মশায় কি বলতে চায়। শ্যামল দাসের আত্মীয় স্বজন বাঁচলে এখানেই বাঁচে। মরলে এখানেই মরে। কোনোদিন মনে হয়নি এখানে মানুষ বাঁচে না। সে বলল—কি বললেন দাদা?

—আরে ছ্যা ছ্যা, দেখছেন না চারদিকে নোংরার পাহাড়। একটা শিশু এই পরিবেশে বাঁচে কি করে? ডাক্তার, নার্স একটাও কাজ করেনা এখানে। বাইরে

প্র্যাকটিস করে আর মাস গেলে মোটা মাইনে গুনবে সরকার। বুঝলেন, সবাই ক্যাডার। হাসপাতাল তো নয়, এক একটা ক্যাডার পোষার জায়গা।

শ্যামলবাবু খানিকটা চুপসে গেল। সে রঞ্জনের দিকে তাকাল। রঞ্জন বাবার কথায় সমর্থন করে বলল—অভিকে এখানে রাখা যাবে না বাবা। কাল সকালেই রিলিজ করে কলকাতার নার্সিং হোমে নিয়ে যাব। রঞ্জনের বাবা অবাক হল—কাল সকাল কেন? এখনই ডাক্তারের সাথে কথা বল।

ডাঃ সুপ্রকাশ মন্ডল দেখছিল অভিকে। রঞ্জনের কথা শুনে তার চক্ষু চড়কগাছ—বলছেন কি? এই অবস্থায় বাচ্চাটাকে রিলিজ করে নিয়ে যাবেন? অবাস্তব, কোনো অবস্থায় ওকে রিলিজ করা যাবে না এখন।

—আমরা স্বেচ্ছায় ডিসচার্জ করে নিতে চাই।

—আপনার সন্তান আপনি নিতেই পারেন। আমি একজন ডাক্তার, আমি কিছুতেই বাচ্চার নাক থেকে অক্সিজেন নল খুলে নিতে পারব না। একটা রাত আপনাদের কষ্ট করে এখানেই ওকে রাখতে হবে। রঞ্জনরা একান্ত অনিচ্ছায় ঢেঁকি গেলার মতো মেনে নিল ডাক্তার বাবুর কথা। কিন্তু রঞ্জনের মাসতুতো দাদা ভজন ডাক্তারবাবুকে শুনিয়ে বলল—কিছু হয়ে গেলে দায়িত্ব কিন্তু আপনার। ডাঃ মন্ডল কিছু না বলে শিশু ওয়ার্ডে চলে গেল।

ভজন সকাল ছ'টায় অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে হাজির। ডাঃ মন্ডল সারারাত ডিউটি করে সবে কোয়াটারে গিয়েছে। তার আসতে দেরী দেখে ভজন প্রায় হুলুস্থূলু বাঁধাতে যাচ্ছিল। এমন সময় ডাঃ মন্ডল ফিরে এলো। তাকে দেখে ভজন চিল্লিয়ে উঠল—এই যে ডাক্তারবাবু, আমাদের পেসেন্ট ছাড়তে দেরী হচ্ছে কেন?

—বাচ্চাটাকে রিলিজ করেই নেবেন?

—তার মানে? রঞ্জন অসহিষ্ণু।

—বাচ্চাটার কন্ডিশন স্টেবেল। অনেকটা ইমপ্রুভ করেছে। আমার ধারণা দিন তিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে। রঞ্জনের বাবা বিরক্তিমাখা সুরে বলল—আপনি আমার নাতিকে এই নরকের মধ্যে রেখে দিতে চান নাকি। ওকে আমরা ভাল জায়গায় চিকিৎসা করাব। রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ডাঃ মন্ডল বললেন—দেখুন মিস্টার কোনার, আমার ধারনা আপনারা বাচ্চার সুচিকিৎসাই চান। চিকিৎসায় কি কোনো ঘাটতি আছে এখানে? এটা ঠিক যে পরিকাঠামো আর পরিচ্ছন্নতায় আমাদের খানিকটা দুর্বলতা আছে। এসবের মধ্যেও আমরা রোগীর সেবাটা কিন্তু করি। বাচ্চা ভাল আছে। জার্নি ধকল নিতে পারবে কিনা ভেবে দেখুন।

অ্যাম্বুলেন্সটা হুটার বাজিয়ে আশি থেকে একশ কিলোমিটার বেগে ছুটছে কলকাতার দিকে। অ্যাম্বুলেন্সে রঞ্জন আর চিত্রালি। পিছনে স্করপিও গাড়িতে রঞ্জনের বাবা সহ সাত আট জনের দল। স্করপিও গাড়ির ড্রাইভারের আশি স্পীডে গাড়ি

চালিয়ে পোষাচ্ছে না। অন্য সময় দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়েতে গাড়ির গতি থাকে একশো থেকে একশো কুড়ি। চক্‌চকে মসরিন রাস্তায় উঠলেই হাত নিসপিশ করে তার। স্বপ্নের দেখা গাড়িটার মতো পাখনা মেলে দিয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছা হয়। এই ড্রাইভার-এর জীবনে আর তো কোনো উড়ানের স্বপ্ন নেই।

অভিকে বুকের ওমের মধ্যে রেখে শুয়ে আছে চিত্রালি। মুখে না বললেও সে বুঝতে পারছে আগের দিনের চেয়ে অভি'র অবস্থা ভাল। বুকের দুধ টেনে চুকচুক করে খাচ্ছে। গতকাল প্রায় সারাদিন এক ফোঁটাও দুধ খায়নি। টানার ক্ষমতাই ছিল না। ভার হয়ে আসা স্তনের মধ্যে টসটস করছিল। দু'তিন বার টিপে ফেলতে হয়েছে। ধীরে ধীরে দুধের বোঁটা টানছে অভি। আধ বোজা চোখে দু'একবার তাকাচ্ছে। দৃষ্টি হয়নি এখনও। তবু চিত্রালি বুঝতে পারে ছোট্ট অভি মায়ের মুখ দেখতে চায়। বুকের ওমে গভীর হয়ে ওঠে মাতৃ অনুভূতি। চিত্রালির গাল গড়িয়ে পড়ে জলের ফোঁটা।

চূড়ান্ত তৎপরতায় চিত্রালির কোল থেকে অভিকে প্রায় ছোঁ-মেরে নিয়ে গেল অ্যাটেনড্যান্ট আর নার্সরা। চিত্রালি বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। তার কানে একটা শব্দ ধরা পরেছে—থ্রি জিরো সেভেন। ডাক্তার আর দু'জন নার্স দেখছে অভিকে। ডাক্তার গম্ভীর গলায় বলল—ভেরি সিরিয়াস কন্ডিশন। চিত্রালির বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। যদিও মন মানতে চাইছে না। অভি'র নীল ভাবটাও তো অনেক কমেছে। তা হলে ডাক্তার কেন বলছে অবস্থা ভাল নেই। চিত্রালি গায়ের মধ্যে ঠান্ডা কম্পন অনুভব করে।

কেমরি হসপিটালের এমারজেন্সি বিভাগের সামনে রঞ্জনের বাবা দাঁড়িয়ে বলল—দ্যাখো, দ্যাখো ভজন হাসপাতাল কাকে বলে। কত টিপটপ। কাউন্টারে ঠিকই লিখেছে ক্লিনলিনেস ইস নেক্সট টু গড। এরকম হাসপাতালে অর্ধেক রোগ আপনা আপনি সেরে যায়। সরকারি হাসপাতাল নাতিটাকে মেরেই ফেলত। শ্যামলবাবু এমন হাসপাতাল আগে কখনও দেখেনি। একজন কেরাণীর কি-ই বা আয় যে আত্মীয় স্বজনকে কেমরিতে চিকিৎসা করানো যাবে। শ্যামলবাবু উদাসীন ভঙ্গিতে স্বস্তিকা চিহ্নের দিকে তাকালো। শিল্পীর হাতে আঁকা স্বস্তিকা চিহ্ন। বাড়িতে আঁকা সিঁদুর গড়িয়ে পরা যে চিহ্ন আঁকা হয় তার থেকে আলাদা। নীচে দেবনাগরী হরপে লেখা—শুভ লাভ। শ্যামলবাবু শুধু বুঝল—লাভ বরাবর শুভই হয়।

সারাদিন ডাক্তার-নার্স মিলে ছেলেটার কি যে চিকিৎসা করল চিত্রালির কিছুই বোধগম্য হল না। সিনেমায় দেখা নার্সদের মতো তাদের হাঁটাচলা, ক্যাটক্যাট। শ্বেতশুভ্র সেবিকাদের ব্যাপার স্যাপার মাথার পাশ দিয়ে ফসফস করে বেরিয়ে গেল। অথচ ব্যাপারটা এমন নয় যে ডাক্তার নার্সরা তাদের পাত্তা দিচ্ছে না। বরং কিছু জিজ্ঞেস করলে ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ঝুলিয়ে উত্তর দিচ্ছে তারা। তবু

এই হালহকিকতে মফস্বল শহরের চিত্রালির মধ্যে এক ধরণের অস্তিত্বহীনতা কাজ করে। ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই ভাব। অস্তিত্বহীনতা বোধ থেকে অভিকে আরো বুকের মধ্যে টেনে নেয় সে। তার নিজের ও বিশ্বাস মায়ের ওমই সন্তানকে দিতে পারে জীবনীশক্তি। কিন্তু বিকেলেই অভি নিপেল টানা ছেড়ে দিয়েছে। বুকের মধ্যে যেন একটা পাথর চেপে আছে। অভি'র শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ফিরে এসেছে নীল ভাবটা। ছোট্ট অভি এখন অনন্ত নীল গহ্বরে একা।

সিনিয়ার ডাক্তার আদিত্য কেডিয়া এলেন, দেখলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিকে পাঠিয়ে দিলেন ভেন্টিলেশনে। চিত্রালি রঞ্জন প্রায় দর্শক। ডাঃ কেডিয়া চিত্রালি বা রঞ্জনের সম্মতির প্রয়োজন বোধ করলেন না। বড় হাসপাতালের এটাই রীতি। শুধু বুঝে নেওয়া গ্যাটের জোর আছে কিনা। সবার মুখ লক্ষ্য করে ডাঃ কেডিয়া শুধু বললেন—উয়ি আর এক্সপ্লোরিং দি বেষ্ট পসিবিলিটিস। রেস্ট অন দি অল মাইটি গড।

গ্লোসাইন আর নিয়নের আলোয় ভেসে যাচ্ছে গোটা হসপিটাল চত্বর। ওয়েটিং রূম থেকে বেরিয়ে অনেকেই হাসপাতাল লনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সবাই প্রায় মূর্তিবৎ। কথাবার্তা বিশেষ নেই। মুখে উদ্বেগের ছাপ। এ নিয়ে পাঁচদিন ভেন্টিলেশনে আছে অভি। রঞ্জনের বাবা একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরে গেছে বাড়ি। যাওয়ার সময় বলে গেছে—আমার যাবতীয় সঞ্চয় শেষ। একজন চাষীর কতটুকু নগদ সঞ্চয় থাকে। ভুলই বোধ হয় করে ফেললাম।

প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল বিলের পরিমান। রঞ্জনের বাবার সব হিসেব নিকেশ গুলিয়ে যাচ্ছিল হাসপাতালের মসৃনতায়। সে কি করে জানবে সুন্দরী নার্স, বিদেশে পড়া ডাক্তার আর নিয়নের আলোর এতো দাম। একজন চাষীর নগদ সঞ্চয় তিন-চার লাখই যথেষ্ঠ বেশী। নিয়নের প্রতি মুহূর্তের দাম মিটানোর যে ক্ষমতা নেই তা সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল। মোহভঙ্গ মানুষটির নিঃশব্দ পলায়ন রঞ্জনকে আরো নিঃস্ব করে দিয়েছিল। মনে হয়েছে মহাশূন্যের অন্ধকারে তার দেহ ঘুরপাক খাচ্ছে। রঞ্জনের মতো মূর্তিবৎ অনেকেই ঘটি বাটিবিক্রির হিসেব করছে।

রঞ্জন এভাবে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষনা করতে হবে আগে কখনও ভাবেনি। শ্যামলবাবুর দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল—বাবা, আমি শেষ হয়ে গেলাম। শ্যামলবাবুর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল চিত্রালি। মাথায় হাত বুলিয়ে সে সান্ত্বনা দিল, কাঁদিস না মা। আমি তো আছি। দেউলগড়া মাঠটা বিক্রি করে দেব। দাদুভাই-র জন্য এটুকু করতে পারব না। বাবার কাঁধ দু'টো আঁকড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে চিত্রালি বলল—বাবা, বলছ কি? চিত্রালি জানে বাবা জীবনের চেয়েও ভালবাসে মাঠটাকে। শহরের উপকণ্ঠে জমিটার জন্য কম প্রোমোটার এসেছে। বাবা বুকে আগলে রেখেছে জমিটাকে। বাবা নাকি মাটিতে কান পাতলে শুনতে

পায় রণডঙ্কার শব্দ। কোন কালে এ মাটিতে যুদ্ধ হয়েছিল একবার। এটাই নাকি শহিদ্দান। মেহেরুনেছার প্রথম স্বামী শের আফগানের বধ্যভূমি। মাটিতে হাত দিতে কেমন আদ্র হয়ে ওঠে তার মন। মনে হয় ঘাতক কাশ্মিরী খাঁ'র তরোয়াল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে মাঠে। শ্যামলবাবুর পূর্বপুরুষদের লাগানো আম-কাঠালে ছেয়ে আছে পুরো জমিটা। দেউলগড়া নামটা যে কেন হল শ্যামলবাবু জানে না। কিন্তু দেউলগড়া নামটায় কেমন উদাস হয়ে যায় মনটা। শ্যামলবাবুর বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। কেমরির নিয়নের আলোর গ্রাসে ডুবে যায় এমন কতশত দেউলগড়া—শহিদ্দানের মাঠ।

গত দু'দিন ধরে বাচ্চাটাকে মোটেই দেখতে দেওয়া হচ্ছে না। চিত্রালি পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছে দরজার কাছে। সেখানে তাকে বলা হচ্ছে—ঢুকবেন না। স্যারের বারণ আছে। বাইরে থেকেই তো দেখতে পাচ্ছেন মনিটরের নীলরেখা। কাঁচের দরজা দিয়ে আবছা একটা সমান্তরাল রেখা দেখা যাচ্ছিল বটে। কিন্তু অভি'র সারা শরীর প্রায় সাদা কাপড়ে ঢাকা। দৌড়ে গিয়ে রঞ্জনকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল—অভিকে ওরা দেখতে দিচ্ছে না কেন? বল! কি বলবে রঞ্জন। নামকরণের দিনে অভি হতে পারত অভিষেক। বা অভিনব। বা প্রমেথিউস। প্রমেথিউস বন্দীত্ব মুক্তির উপায় খুঁজে বের করেছিল। কিন্তু ছোট্ট অভি'র অত শক্তি কোথায়? অভি তো চক্রব্যূহে বন্দী। রঞ্জনের মাথায় বিদ্যুৎবেগে অভি'র নাম বিবর্তিত হয়ে যায় অভিমন্যুতে। অভিমন্যু চক্রব্যূহ থেকে বেরনোর রাস্তা জানে না। চিত্রালির মধ্যে মাতৃত্ব উথলে ওঠে। স্তন গড়ানো দুধে ভেজা সালোয়ার-কামিজ লেপ্টে যায় গায়ে। বুক চেপে ধরে চিত্রালি—অভি না খেলে আমার আর থাকল কি! ওরে অভিরে।

ঠিক সেই সময়ে একজন জুনিয়ার ডাক্তার নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। দু'এক বার অভিকে চেক করেছে। শ্যামলবাবু দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—ডাক্তারবাবু, আমার নাতি কেমন আছে?

—ভেরি মাচ ক্রিটিকাল।

—বাঁচবে তো?

ডাক্তার হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের লনে বেরিয়ে এলো। এদিক ওদিক ভাল করে দেখে বলল—আমি এখানে চাকুরি করি। প্রোটোকল মেনে আমার কিছু বলার নেই। বলতে পারেন খানিকটা বিবেকের দায়ে বলছি—বাচ্চাটাকে দু'দিন আগেই নিয়ে যেতে পারতেন। ক্যান উয়ি গিভ অ্যানিবডি লাইফ? প্লিজ আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। ডাক্তারবাবু হনহন করে এগিয়ে গিয়ে উঠে পরল গাড়িতে।

শ্যামলবাবু উদ্ভ্রান্তের মতো ছুট লাগাল ইনকোয়ারি কাউন্টারের দিকে। কাঁচের উপর জোরে থাপ্পর মেরে সুন্দরী রিসেপসনিস্টদের নজর কাড়ার চেষ্টা করল। গলার উপর তার নিয়ন্ত্রন নেই। তারস্বরে চিৎকার করে বলল—বাচ্চাটাকে দেখতে

দেওয়া হচ্ছে না কেন? পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ভজন, সে হাতা গোটাতে গোটাতে গিয়ে বলল—মামদা বাজি হচ্ছে, না। এক্ষুনি দেখতে দিতে হবে আমাদের পেসেন্টকে। নইলে জ্বালিয়ে দেব। ভিতর থেকে দু'তিন জন সহায়িকা কিছু বলার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে বাইরের অনেক লোক জড় হয়ে গেল। হৈ-হট্টগোল্লের মধ্যে ডাঃ কেডিয়াকে ডেকে আনা হল। এসেই বললেন—বাচ্চাটার অবস্থা ক্রিটিকাল, বাট উয়ি আর হোপফুল। আপনারা কি চান ভেন্টিলেশনের নল বাচ্চাটার মুখ থেকে খুলে দিই। আর চোখের সামনে ছটফট করে মরে যাক। আপনারা কি চান সেটা আপনাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রঞ্জন ধরা গলায় বলল—বাইরের থেকে স্পেসালিস্ট ফিজিসিয়ান এনে ওকে চেক করাতে দিন।

ডাঃ কেডিয়া হতচকিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন—ওকে, লেট আস ডিসাইড ইন দিস রেসপেক্ট। বলেই গটগট করে চলে গেলেন লিফটের দিকে।

ঠিক আধঘন্টা পরে একজন অন্য ডাক্তার যমদূতের মতো নেমে এলো। হাতে একটি চিরকূট। নিউজ বুলেটিন পড়ার মতো পড়ে গেল চিরকূটটি— অভি কোনার, সন অফ রঞ্জন কোনার দশ মিনিট আগে অর্থাৎ বারটা তের মিনিটে মারা গেছে। মে গড লিভ হিম ইন পিস। শ্যামলবাবু আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ডাক্তারবাবুকে এক ধাক্কায় চিৎ করে ফেলেদিল। হাতে ছিল সদ্য কেনা টিফিন কেরিয়ারটা। ক'দিন সেটায় বাইরের থেকে সবার জন্য খাবার এসেছে। সেটা দিয়ে ইনকোয়ারি কাউন্টারের কাঁচের সেপারেটর ভেঙ্গে ফেলল। ঝনঝন করে কাঁচের টুকরো আছড়ে পড়ল সাজানো মার্বেল মেঝেতে। ভাঙ্গা টুকরোর মধ্যে শ্যামলবাবু হতভম্ব মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। যা সব নিমিষে ঘটে গেল, তার কোনো কিছুর উপর শ্যামলবাবুর নিয়ন্ত্রন নেই। সে যেন দাঁড়িয়ে থাকা স্থির জমাট বাঁধা মেঘ।

শোফার এক কোনে গুটিশুটি মেরে কুন্ডলি পাকিয়ে আছে চিত্রালি। তার বাকশক্তি নেই। কাঁদার ক্ষমতা নেই। চোখের সামনে আবছা অন্ধকারে সব কিছু চড়কির মতো ঘুরছে ভনভন করে। চক্রবুহ্যের চারদিকে ডাঃ কেডিয়া, মনু, কেমরি হাসপাতাল, ছুরি হাতে সাইলকের মতো রথি মহারথি উল্লাসে নাচছে অভিমন্যুকে ঘিরে। অভি যতবার পালাতে যাচ্ছে দরজা জানালায় পাতা নীল সুতোর ফাঁদে আটকে যাচ্ছে পা। পালাবার পথ নেই।

ভিতরের কাঁচটা তখনও অক্ষত ছিল। স্বস্তিকা চিহ্ন দুলে দুলে নেচে যাচ্ছে আনন্দে। স্বস্তিকা চিহ্ন অবিরাম গেয়ে চলছে প্রিয় গান—শুভ লাভ। ওঁ শুভলাভ। গোটা কেমরি হাসপাতালটা মিষ্টি সুরে গলা মিলাচ্ছে স্বস্তিকা চিহ্নের সুরে।

খোয়াজ খিজিরের গপ্পো

ওত পেতে থাকা দু'টি ভ্যাসালের হা করা মুখ প্রায় এক সাথে জেগে উঠল জলের উপর। ভ্যাসালের খুঁটিতে বাঁধা ডিঙ্গি নৌকা। কুপির আলো দপদপিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। যেন প্রাণ সংশয়ে ভোগা মানুষের আশা নিরাশা। তিন দিক জলের উপর সমান্তরাল ত্রিভুজাকৃতি ভ্যাসাল। জলের মধ্যে জাল। মাছবন্দী খেলাঘর। মাকড়সার মতো জাল গোটাতে গোটাতে বুকাই বর্মন বলে—শুকুরভাই, কি মাছ পরছে?

—মাছ! একটা চ্যাং বুঝল্যা। একটা চ্যাং। নদীর পানিতে মাছ নাই। পানি মুখে দেও, দ্যেখবা বিষ। পোকা মারা বিষের জ্বালায় খোয়াজ খিজিরের গায়ে ফোস্কা পরে গ্যাছে। খিজির সাহেব এমনি এমনি ছাড়ইয়া দেবে। সব মাছ তাড়াইয়া দিছে সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে। মোরা জিয়নীরা মরমু আর কি।

—তোমাগো খোয়াজ খিজির আসলে আমাগো মশান দেবতা। কোচবিহারের গোসানীতে পূজা হয় মশান ঠাকুরের। পালোয়ানের মতো গদা হাতে পাহারা দেয় খাল বিল। এহ্যানে তো আর মশানদেব নাই। ইচ্ছা হয় খিজির সাহেবের উরুশে পূজা দেই। নদীতে যদি আগের মতো মাছের ঢল নামে।

অঃ মিঁয়া, দিনদুপুরে খোয়াব দ্যাখছ। ওঠো দেখিই। উঠনে টাঁই করা জালের উপর আধ শোয়া শুকুর আলি। চোখে তন্দ্রাভাব। সে খোয়াবের মধ্যে ঘুরছে অন্য ভূবনে—খোয়াজ খিজিরের জন্য ভাসানো তাজিয়ায় বুকাইর দেওয়া আংটি। পাট্টার জমিটুকু বন্ধক রেখে আংটি গড়েছে সে। এই এক হ্যাপা। সরকারের দেওয়া সামান্য জমিতে না ভরে পেট আবার নদীতে মাছ নেই। খিজির সাহেব খুশি হলেই মিটে যাবে সব সমস্যা। জলের তলে আলোর বৃত্ত ঘিরে রূপালী সোনালী মাছ।

হালিমার ধাক্কায় ধরফরিয়ে ওঠে শুকুর মিঁয়া—আঃ আঃ। কি হইল। সামনে হালিমার কাঁখে ঝুড়িতে কুড়ানো ডালপালা। হালিমার শাড়িতে ছেঁড়া ভারতবর্ষের মানচিত্র। তার নিত্যদিনের এই চেহারা। শুকুর মিঁয়ার চোখ সওয়া হয়ে গেছে।

—আবার বুঝি খোয়াব দেখছ, পানির নীচে অনেক মাছ।

শুকুর মিঁয়া কোনো কথা বলে না। উদ্ধত মোরগের কক্ কক্ ডাকে ডুবে যাচ্ছে তার ভাবনা। মানুষ আর মোরগের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। দু'টি প্রাণীরই

খুঁটে খাওয়া জীবন। অথচ জৈবিক তাড়নায় ছোটা মোরগের কি রাজকীয় ভাব। বড় বিপন্ন মনে হয় শুকুর মিঁয়ার। চল্লিশ যৌবন নিয়েছে কেড়ে। জীবন চাল্লিশা গাইতে গাইতে তার চোখে শুধুই খোয়াব, নদীর পানিতে খই ফোটানো মাছ।

সকাল বেলা বুকাই বর্মন ছুটতে ছুটতে এলো-ও শুকুর ভাই, শুনছ সরকার নোটিশ দিছে নদীতে একমাস মাছ ধরা চলবে না। ভ্যাসাল তুলে ফেলতে হবে। নইলে জাল নৌকো আটকাবে।

—ক্যান?

—আরে বেড়া উৎসব। কোনো এক মন্ত্রী চিরাগ জ্বালাইয়া উদ্বোধন করবে।

—গায়ের জোর বুঝল্যা বুকাইদা। যারা সিরাজ, লুৎফানেচ্ছাকে নদীর ওপারে পাঠাইছে বনবাসে তারা করে ঘটা। তুমি আমি সারা রাত বাতি জ্বেলে সবার আত্মার ভাল চাই। আর এই সময় বাবুরা আসে ফুর্তি মারতে। আমাগো ভাত মারতে।

বুকাই বর্মনের রাগে গা শির শির করে—থাকত যদি রাণী রাসমণি। মালো-কৈর্বত্যদের ঘরে ঝনঝনিয়ে উঠত বৃষ্টির ফলার বর্শা। বুকাই বর্মন বোঝে তা হবার নয়। সে মোটেই আজকাল মানুষের শ্রেণী চিনতে পারে না।

হালিমা দাঁড়িয়ে শুনছিল তাদের কথা। এখন তার শীর্ণ দাড়কাকের মতো চেহারা। কুড়ি বছর আগে আলতা পায়ে উঠনময় হালিমার হাঁটা শুকুর মিঁয়ার চোখে জড়তা আনত। তার ডালিম বুকে পরতে পরতে রহস্যময় ইশারা। শুকুর বলত, তুমি আমার ছোট্ট কুটুম পাখি। জাল ফেলা ডিঙ্গি নৌকায় নিয়ে যেত তাকে। বিকাল সন্ধ্যার সীমারেখা মুছে অন্ধকারে ডুবে যেত নদী। শুকুর মিঁয়ার কুটুম পাখি গাইত গান জোনাকি উৎসবে। গাঙ ফরিং-রা সুর মিলাত হালিমার সাথে। আর প্রতিবারই শুকুর মিঁয়া যেন দেখতে পেত সাদা আলখাল্লা পড়া এক বুড়ো নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে ভেবে পেত না বুড়ো ফকিরের দেশ কোথায়। তবে কি সেই দরবেশ যে একদিন কারবেলা থেকে ছুটিয়েছিল সাদা ঘোড়া। মরুভূমিতে পানির বান আনতে। তৃষ্ণার্ত ঘোড়া ছুটতে ছুটতে ভাগীরথীর পারে দু'পায়ে ভর দিয়ে ডেকে উঠেছিল হ্রেষা। নদীকে ভালবেসে ভাগীরথীর জলে বিলিন হয়ে গেলেন খোয়াজ খিজির। আর হালিমাই এখন মাঝে মাঝে অনুভব করে—খোয়াজ খিজির নির্বিকার। ভাব নেই। ভাবান্তর নেই। নদীর পানিতে মাছ নেই।

আশেপাশের গ্রাম যেন ভেঙ্গে পরেছে নদীর পারে। এরা কেউ চাষী, কেউ জেলে। তাদের বউ ঝিদের চোখে আনন্দের বন্যা। ব্যতিক্রম নিউ প্যালেসের মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকা হোডিংটা। সেখানে উদ্দাম যুবকযুবতী এক ঝাঁক পায়রা উড়িয়ে বহুজাতিক সংস্থার নীল আবাসনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। জনতার দৃষ্টি সেদিকে নেই।

আজ যে বাগেশ্বর হালদার, নেপু বাউড়িদের মতো অনেকে ঝেড়ে পুঁছে নৌকা নামিয়েছে জলে। বাগেশ্বরের বাবা বানিয়েছিল বাইচ নৌকা। গলুই রাঙানো থাকত টকটকে লাল সিঁদুরে। আর দু'পাশে চুন কালি দিয়ে আঁকা চোখ। খোয়াজ খিজিরের উরুশের বাইচে সবাই চিনত তার নাও। সে কতকাল আগের কথা।

ভেলার উপর তাজিয়া। তাজিয়ার মাথায় কালো কাপড়ের নিশান। নিশানের চারদিকে রাংতার চিকচিকি। বুকাই বর্মন নতুন ধুতি-গেঞ্জি পড়ে তাজিয়ার কাছে এসেছে। হাতে ছোট্ট বাক্সে নিজেকে উজার করা আংটি। পিছনে লাল পাড় শাড়ি পড়া মোম নিয়ে তার বউ। গোটা একটা লাল সূর্য টিপ তার কপালে। ভেলার চারদিকে জ্বেলে দেয় সে এক একটা মোম। মোম হাতে আমিনা খালেদাদের লম্বা লাইন। বুকাই বর্মন তাজিয়ার উপর চাঁদোয়ায় আংটি সুদ্ধ বাক্সটি রেখে কপালে জোড়া হাতে প্রণাম করে—জয় বাবা খোয়াজ খিজির। খোয়াজ খিজিরের জয়। বুকাই বর্মনের শরীরে চাপা শিহরণ। আংটির দাতা হিসাবে তাকেই ভাসাতে হবে ভেলা। আগে তার জায়গায় দাঁড়াত নবাবরা। সে ছিল একদিন। এখন জেলে কৈর্বত্যদের জন্য স্পঙ্গর এক অলীক কল্পনা।

টানটান উত্তেজনায় ভাসছে তেরখানা নৌকা। দু'একখানা বাইচ নৌকা পুরাণো দিনের। বাকি সব জেলেদের ছোট নৌকা। আধ কিলোমিটার তাজিয়া ভেসে গেলেই শুরু হয়ে যাবে দমবন্ধ লড়াই। তালে তালে বৈঠার আওয়াজ—ঝপাত ঝপাত। নৌসাদ, শুকুর মিঁয়ার ছেলে শক্ত হাতে ধরে আছে দাঁড়। বৈঠা হাতে আরও দু'জন মাঝি। সামনের গলুই-এ নিশান হাতে স্থির মূর্তির মত শুকুর মিঁয়া। প্রাণের দু'কূল ভেসে যাচ্ছে—আল্লা দোয়া কর। বুকাইর কষ্টের মানতে সদয় হও মুশাফির। খিজির হুজুর............। শুকুর মিঁয়ার মাথা যেন আর কাজ করছে না। আংটির মতো একটা সোনালী বলয় ঘুরে যাচ্ছে। খিজিরের ছোঁয়ায় তা এক আশ্চর্য্য জিয়ন কাঠি। কত যুগের মাছেরা ফিরে পাচ্ছে প্রাণ।

শক্ত হাতে হাল ধর। জোরছে মারো টান মাঝি, জোরছে মারো টান। হেইও হো, হেইও। প্রত্যেকটা নৌকায় জীবন মরণ প্রতিযোগিতা। আগে তাজিয়া ছুঁতে পারলেই কেল্লাফতে। ঘরে উঠবে কষ্টের আংটি। খোয়াজ খিজিরের দোয়া পাওয়ার এমন নিশ্চিত সুযোগ হাত ছাড়া করতে চায় কে? বাগেশ্বরের বাইচ নৌকা তির বেগে ছুটছে তাজিয়ার দিকে। শুকুর মিঁয়ার বুক চুরমার হয়ে যাচ্ছে—মারো জোরে টান। হেইও হো, হেইও। হাল সোজা রাখ নৌসু। আর একটু। আর একটু। হেইছা মারো টান। শুকুর মিঁয়া সামনের দিকে তির্যক করে নিশানটা আগে পিছে দোলাচ্ছে তালে তালে। তাদের নৌকা ধরে ফেলে ভাটির টানে তির হয়ে যাওয়া বাগেশ্বরের বাইচ নৌকা। শুকুরের নৌকা বাগেশ্বরের বাইচ নৌকার সাথে আলোর বেগে ছুটছে

ভাগীরথীর টানে। দু'কূলের মানুষেরা স্থির নিশ্চল। আল্লা আর একটু শক্তি দাও। শুকুর মিয়ার চোখের সামনে ছুটে যাচ্ছে নদীর তীরে দমবন্ধ জনতা। হালিমার মুখ, তার শাড়িতে ছেঁড়া ভারতবর্ষ। আর মাত্র কয়েক কদম দূরে তাজিয়া। প্রায় নাগালের মধ্যে। হঠাৎ নৌকাটা চড়কির মতো ঘুরে গেল বিপরীত দিকে। নৌসাদ চিৎকার করে উঠলো—আব্বাজান। শুকুর মিয়া ছিটকে চলে যাচ্ছে জলের গভীরে। অনন্ত জলরাশির অতলে। সাদা ঘোড়ায় আলখাল্লা পড়া লোকটা ছুটছে। তার সাদা দাড়ি, লম্বা চুল ভেসে যাচ্ছে আলোর বুদবুদে। ঝাঁকে ঝাঁকে রূপালী মাছেরা চেখে দেখছে মানুষের লোনা স্বেদগ্রন্থি।

পরজীবীর আঠা

—পিঠ থেকে লামিয়ে দে শাকিলা। তোর পিঠ ব্যাথায় কাতরাইছে। গাছের ছায়ায় একটু জিরা। মুখখানা মুছাইয়া দিই। তোর শরীল আর বইছে না। শাকিলা কথায় কান দেয় না। যন্ত্রণার উপলব্ধি নেই শরীরে। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে। মোহনবাগান মাঠের ফুটপাথ ধরে গতি বাবুঘাট বরাবর। পিঠে বিয়াল্লিশ বছরের মুশা মিঁয়া। ল্যাংড়া পা দু'টো শাকিলার কুনইর ভাঁজে। দু'হাতে গলা জড়িয়ে শাকিলার শরীরে সে লেপ্টে আছে অবিকল বাঁদর বাচ্চার মতো। মুশা শাকিলাকে ঝাঁকায়—গঙ্গার দিকে যাছ ক্যানে শাকিলা।

—নদীতে ঝাঁপ দিয়া মরমু। তুই বইয়া বইয়া মোর মরণ দেখবি। গঙ্গায় মল্লে নাকি পুন্নি হয়।

—আমারে রাইখা তুই মরতি পারবি শাকিলা?

—ইস্ আমার নাং কোথাকার! তোর সাথে আমার কিসের পিরিত।

মুশার হাত আলগা হয়ে আসে। সত্যিই তো তাদের মধ্যে কিসের সম্পর্ক। সম্পর্ক নিয়ে আগে কখনও কথা হয়নি তা নয়। এমন দিন তো আগে আসেনি কখনও। এ গড়ালে ও গড়ায়। তবু তাদের কোনো সামাজিক বন্ধন নেই। অথবা প্রয়োজনই হয়নি। অথচ তের বছর ধরে একসাথে বাস। যেদিন শাকিলা তাকে তুলে এনেছিল মনুমেন্টের পিছন থেকে। দু'দিন প্রায় বেহুঁশ ছিল মুশা। মুশার স্মৃতি দ্বগদ্বগ করে ওঠে—মুন্নাভাই সন্ধ্যায় এলো ভিখারিদের ডেরায়। মুশাকে নিয়ে সাতজনের আস্তানা একবালপুরে বস্তিতে। সবাই পেশায় ভিখারি। মুন্নাভাইর অন্ডারে কাজ করে ওরা। দরজা ঠেলে মুন্নাভাই ঘরে ঢুকেই ঠান্ডা গলায় বলল—মুশা তু কাইল থেকে গড়িয়া মোড় মে ভিক্ মাঙবি।

—ক্যানে, মেট্রো গলিতে বসমু না?

—আবে শালা, রান্ডিকা বাচ্চা পোশ্ন করে। উধার তেরা বাপকা জমিনদারি হ্যায় নাকি। দো'দিন তক একশো টাকা দিচ্ছিস। মেট্রো ফুট কা রেট কেতনা, জানতা হ্যায়? আউর চোরি পয়সা দিয়ে গতর বাড়াতা হ্যায়; মুশা তার দিকে তাকানোর সাহস পায় না। মেট্রো ফুটের রেট নাকি বেড়ে গেছে। কিন্তু দু'দিন ধরে একশ পনের কুড়ি টাকার বেশি কাজ হয়নি। অসার পায়ে দু'হাঁটু উঁচু করে তার মধ্যে মাথা গুঁজে এক নাগাড়ে বসে থাকা কি যে কষ্ট মুন্নাভাই কি করে

বুঝবে। বললেই বলে—শালে, কষাই খাশির কষ্ট বোঝে। বেশ্যা পল্লীর মাসিরা অন্যের গতর খাটানো পয়সার হিস্যা নেয় না? মুন্নাভাই দেখতে চায় পিঠের কুঁজো ভাবটা আর গলার মধ্য থেকে নীচুস্বরের বেরিয়ে আসা আল্লা। আ-আ-আ-ল্লা-ল্লা, তা হলেই থালার উপর ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ। কোনোটা ভারী কোনোটা হাল্কা। এক দুই পাঁচ। পঞ্চাশ পয়সার চল নেই বল্লেই চলে আজকাল। মুশা অনুভব করে তার শরীরে কুঁজো ভাবটাই আসতে চায় না। পোড়া শরীরই বোধ হয় আগে পোষ মানে। তা না হলে ভিখারির শরীরেও মেদ আসে? পোলিওগ্রস্ত পা দু'টো সেই চির রুগ্ন। শরীরের সাথে পা দু'টোর বেঢপ মিল। কুঁজো ভাব আনতে গিয়ে শিরদাঁড়া টনটন করে। কখনও কখনও মাথা উঁচু করে মুশা বসে থাকে চুপচাপ। অবাক লাগে মেট্রোগলিতে কত রংবেরং-এর মানুষের আনাগোনা। যেন চিরশীত। এই চেনা অচেনা মানুষগুলোর অনেকেই শরীরশিল্পী। শরীর ভাঙ্গার রকম ফের আরকি। যদিও ভিন্ন ভিন্ন। মুশার পাশে বসে নিরাজের ডালা। জামা কাপড়ের হকার, নিরাজ এখন মুশার জিগরিদোস্ত। কিন্তু প্রথম দিন তাকে দেখে নিরাজ হেঁসেই কুটো—এ ল্যাংড়াটাকে আবার কোথা থেকে আমদানি করলে মুন্নাভাই। তোমার চোখ আছে মাইরি, পাবলিক খাবে। হল্লা এলে নিরাজরা ডালা ফেলে পালায়। একমাত্র পাহারাদার মুশা। যদিও চোর পুলিশ খেলা শেষ হতেই কচুরিপানার মতো ফিরে আসে হকাররা। পুলিশ রুটিন মাফিক হল্লা শেষে ঢোকে মেট্রোগলিতে। মুশা জানে এর রহস্য এখন। মুন্নাভাই, কামাথ ভাইদের ভিখারি হপ্তা, হকার হপ্তা দিতে হয় পুলিশকে। মুশার সুবিধা একটাই। তাকে কেউ দেখেও দেখে না, যদিও আয়ের ভাগিদার অনেক। এই একে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা নাকি স্থিতাবস্থার সহায়ক। মুশার বড় অবাক লাগত মেট্রোগলির মেয়েদের। কে যে আসল কে যে নকল। সবাই সবাইকে টেক্কা দেয়। মুশার এখন ভিখারি পেশায় বয়স বেড়েছে মেট্রোগলিতে, ফুটে বসে। মুশা জানে বাবুরা বেছে বেছে কাদের কানের কাছে বলে—দর কত। যাবে? খদ্দেরের সাথে ভেসে যায় তারা হাসিমুখে। চোখের অলক্ষে আদ্র চিক্ চিক্। মুশার মাথা আরো দু'হাঁটুর ফাঁকে ডুবে যায়। কুঁজ কাঁপিয়ে বেড়িয়ে আসে আল্লা—আ আ ল্লা। আ আ আ ল ল্লা।

আব্বে শালা, বাত থা না গড়িয়া মোড়ে বসবি। দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি। আবার মেট্রোর সামনে বসেছিস। বলতে বলতে মুন্নাভাই টুপি সুদ্ধ টেনে তুলল অনেকটা। পাছায় দুমাদম লাথি। মরা পাছায় লাথি, প্রত্যেকটি মুশার হাড়ে গিয়ে লাগছে। যন্ত্রনায় তার অনুভূতি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আল্লার কসম, ছাইয়্যা দেও। গড়িয়ায় কাম হইলে কি আবার আইতাম। তোমার পয়সাও হয় না। প্যাটে পরেনি দু'দিন প্রায়। মুশার কথায় কান নেই মুন্নাভাই'র। টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে চুলের মুঠি ধরে হিঁচরাতে হিঁচরাতে টেনে নিচ্ছে মুন্নাভাই—রান্ডিকা বাচ্চা, পয়ছা হোবে কোথা

থেকে। ষাঁড়ের মত গতর বানাইছ। হলের সামনে বৈঠে বৈঠে ছিরো বনগিয়া, মুশার হাঁটু থেকে ঘষায় ঘষায় রক্ত ঝরছে। নতুন আমদানি করা ভিখারিটা বসা ছিল একটু দূরে। একজন তাকে আড়পাঁজা করে বসিয়ে দিল মুশার জায়গায়। ভিখারির আসন কখন খালি থাকে না। নতুন ভিখারির খালি পিঠে মেরুদন্ড ত্রিভূজ আকৃতি হয়ে আছে। দড়ির গাঁঠের মতো মেরুদন্ডের প্রত্যেকটি গিট। পঙ্গুপায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে দেওয়ার পর যেন কুকুর কুন্ডলী। খানিকক্ষণ বাদে বাদে বুকের ভিতর থেকে টেনে তুলছে—আল্লা। আ আ ল্লা ল্লা। প্রথম স্বরটাকে অনুসরণ করছে অসংখ্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর। মুশার ব্যথার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে—সত্যিই তো মেট্রো ছিনিয়ে নেওয়ার যোগ্য ভিখারি।

—বাঁচালি ক্যানে শাকিলা? এখন প্যাট চইলবে কি করে।

—চুপ কর মিঁয়া। আল্লাই প্যাট চালাবে। মোর পিঠে চরয্যা ভিক্ষা মাগবি, সারা কইলকাতায়। আগে তোরে দেখে মোর কত হিংসা হোইত।

—ক্যানে, ন্যাংড়া ভিখারিকে আবার হিংছা। মুশা হাসে।

—গলির মাইয়াগুলার দু'একটাও তোরে হিংসা করে। দেখতেই চেকনাই। ভিতরে ভিতরে খাঁ খাঁ আগুন। শরীল বেচা পয়সা। বেজন্মাগুলো শরীল খুবলায় আবার তারাই ঘেন্না করে।

—তুই তো আর ওদের মতো না। তায় হিংছা কিসের।

—ওই রকম বাইরে থেকে নাগে। দোকানে দোকানে এক একটা শিয়ালের বাস। সুযোগ পাইলেই ছাইন্যা ঘাইট্যা দেয়। আলি চাচার কাপড়ের দোকানের কথা কই নাই। বুড়া পাঁচ ওয়াকতো নামাজ পড়ে। খানদানি খানদানি ভাব সব সময়। ও শালা কুত্তার বাচ্চার জিভ লকলক করে। ফাঁক ফোঁকর পাইলেই চাইট্যা দেয়। অন্য সময় নিকিরীকা ল্যাড়কি বলে ছায়া মাড়ায় না। গা ঘিনঘিন করে। গরীব মাইয়াছেলের ঘেন্যায় কি হয় অগো। আঁতর মাখলিই সব খালাস।

পিলখানা বস্তির ন'ফুট বাই সাড়ে পাঁচ ফুট ঘর। মুশা শাকিলার সংসার। আজ চৌরঙ্গী তো কাল হাওড়া স্টেশন। শাকিলার পিঠে বাঁদর ঝোলা মুশা। শুধু এড়িয়ে চলে মেট্রোগলি। ধারে কাছে গেলেই রে রে করে তেড়ে আসে মুন্নাভাই'র লোকজন। শাকিলাকে দেখলে আজকাল মাথায় খুন চেপে যায় মুন্নাভাই'র। আধমরা মুশাকে তুলে এনে শাকিলা গিয়েছিল মুন্নাভাই'র ডেরায় কৈফিয়ৎ চাইতে—মুশা মিঁয়াকে কেন মেরেছ অমন করয্যা।

আঃ পিরিত কত! ক্যানে মেরেছি তার জবাব দিতে হোবে একটা রান্ডি মাগিকে। ফোঁট ইহাসে। আউর হাত পা ভাইঙ্গা হান্দাইয়া দিবো তোর শরীরে। শালি, তু ভিখ মাঙবি মেট্রো গলিমে। ডেরায় তিন সাগরেদ খুচরো পয়সা গুনতে ব্যস্ত। একজন মাথা তুলে বলল—মালটাকে একবার চেখে দেখব নাকি? মুন্নাভাই'র পাশে বসা

ছিল একজন সাদা পোশাকের পুলিশ। ভাগ পেয়ে গোঁফে তা দিতে দিতে মুচকি হেঁসে বেরিয়ে গেল।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বস্তির রাত। পিলখানা বস্তি যেন ধ্বংস ধূসর মায়াবি। আনাড়ি সুরে মুশা গেয়ে চলছে—মানব দেহ অতি যত্নে গরাইছেন সাঁই। দেহ তত্ত্বের গান। গান গেয়ে ভিক্ষা চাইলে বেশি আয়। নর্দমার ভোদকা গন্ধে ঘর বাইর একাকার। শাকিলা মুশার পাশে এসে বসে—অ্যাতো রাতে দেহের গান গাও মিঁয়া? চাঁদের আলোয় দেহের ভাব আইছে নাকি। কি যে কস। যার দোহই নাই, তার আবার ভাব। জন্মাবার তিন দিনের মাথায় কোথা থেকে আইলো এক পীরবাবা। মাথা ভরা ঝাঁকড়া চুল, এক মুখ লম্বা দাড়ি। গোড়ালির আগ পর্যন্ত ঝুল কালো আলখাল্লা। আমারে দেইখ্যা নানিরে নাকি কইছিনু ব্যাডাড়ার নাম রাইখো মুশা। অনেক মুর্শেদি লক্ষণ। ক্যানে যে মুশা হইলাম। ছোটবেলায় কত শুনেছি ঢোলখোলা মাঠের ঐ মাথায় নাকি থাকে এক মুর্শেদ ফকির। একতারা বাজাইয়া গান গায়। পাখিরা ডালে ডালে বছে তার গান শোনে। কে যে হেই মুর্শেদ খোদাই জানে। পাছা ঘষটাইতে ঘষটাইতে পুকুরপার যাইতাম, যদি কেউ মুর্শেদের কথা কয়। কোথাকার মুশা কোথায়? আমি হলাম কিনা মুশা। হালা ন্যাংড়া ভিখারি!

—শাকিলা, শাকিলা....... চৌকির উপর থেকে কলের গানের মতো ডেকে যাচ্ছে মুশা। সারা ঘর নর্দমা আর ঘরের নোংরা জিনিসপত্রের পুঁতিময় গন্দে ম-ম করছে। শাকিলা, রতু হারামিটার কাছে গেলি নাকিরে। মুশার অন্তরে তীব্র বেদনা। শাকিলাকে যেন ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা দৈত্য। তার বাহুর মধ্যে শাকিলা খিলখিল করে হাসছে। পৌরুষ উত্তাপে গলে যাচ্ছে শাকিলা। নিজের অসমর্থ পা দু'টোয় ঠাস ঠাস করে চড় মারছে মুশা। ক'দিন ধরে পাশের খুপরিতে আসা ঝালমুড়িওয়ালাটার গায়ে ঢলে পড়ছিল শাকিলা। যেন গরম হওয়া গাই। অসহ্য লাগত মুশার—শাকিলা তুই যাছ না ওই দিগে। রতন না রতু! ছাই। ক'টাকা আয় করে হারামিটা। মুশার ভয় ছিল কোনো একদিন শাকিলা উড়ে যাবেই। আবার ভাবত কই তের বছর ধরে তো গেল না। তখন হাটখোলা দরজাটা বড় শূন্য করে দিচ্ছে মুশাকে। শাকিলা ফিরে এলো রাত তিনটায়। দলামুথা ঘাসের মতো, তৃপ্ত, আলু থালু বেশে। ক্যানে আইলি? মোর কি মদ্দা মানুষের ক্ষমতা আছে। শাকিলা মাথা নীচু করে বলে—ও কথা ক্যানে কস মিঁয়া।

—রাখ তোর মিঁয়া। তুই কি আমার নিকা করা বিবি?

—শাদি হয় নাই ঠিকই। কিন্তু তোরে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না মিঁয়া।

মুশা খেঁকিয়ে ওঠে—ভুলানো কথা রাখ। তুই একটা বারোয়ারি মাল। মোর পয়সায় খাস আর শরীল দ্যাস ওই হারামিডারে। শাকিলার তৃপ্ত ভাবটা নিমেষে উধাও হয়ে গেল। চোখ ফেটে কান্না আসতে চায়—প্যাট আগেও চালাইতাম মিঁয়া।

কতবার কইছি বুড়া কুত্তাগুলা মোর ইচ্ছা ছাড়াই খুবলাইত। শরীল চাইত না। অ্যাহন শরীল চায় যে। শরীলের রোগ ক'দিন চাপা যায়, কও মিঁয়া।

—তাহলে যাসনা ক্যানে তোর নাংদের সাথে। ওর পয়সায় খাবি।

—পয়সার খোটা দিও না মিঁয়া। তোমার আয়ে আমার ভাগ নাই। মুন্নাভাই তোমারে কুত্তার মতো মারল। আমার পিঠে ঝুলয়া ঝুলয়া ভিক্ষা মাগো। অ্যাহন দু'টো গরমভাত পাও। সব মিছা?

সব সত্যি। আয় বেড়েছে, বাসি পচা খেতে হয় না। অনেকটা স্বাধীন জীবন। কিন্তু তা বলে শাকিলাকে ভোগ করবে অন্যে? মেনে নিতে কষ্ট হয় মুশার—কাইল থেকে তোর মুখ যেন না দেহি।

—ওকথা কইও না মিঁয়া। তোমার শরীল মনের সাথে যে মোর কি ভাব জানি না। কহনও কহনও মনে হয় তুমি বুঝি সত্যিই মুর্শেদ। আবার পোড়া শরীলে তোমার শরীল ন্যাপ্টানো গন্ধ। কোনো ভ্যাদ নাই তোমার শরীল আর আমার শরীল। কে শাকিলা, কে মুশা।

ফন্দির কথা ছাড়। কাইল যে দিকে পারবি চইল্যা যাবি—মুশার মাথা কাজ করছে না। অসহ্য যন্ত্রনায় কাতরে ওঠে—হায় আল্লা। আল্লা-আঃ আঃ।

নদীটা ভাঙতে ভাঙতে চলে যাচ্ছে মোহনায়। আল্লার আসমান নীল উদাসীন। চিমনির ধোঁয়া চেষ্টা করেও ঢাকতে পারেনি অসীম আকাশটাকে। মুশা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শাকিলার পিঠে। শাকিলার গাল বেয়ে টসটস করে গড়াচ্ছে জলের ধারা। সম্পান নাও এর মাঝিদের হিও হিও হো রবের মাঝে মুশা বলে—জানিস শাকিলা, বনবিবির সাথে এ্যাকদিন বড়মিঁয়ার দেখা হেঁতালের আড়ালে। বড়মিঁয়ার হাত পা অসার, নড়াচড়ার ক্ষমতা নাই। বনবিবির আলোয় বড়মিয়াঁর প্রায় কানা হওয়ার দশা। বনবিবি চইল্যা যাইতেই বড়মিঁয়া দেখে তার গলায় হেঁতাল ফুলের মালা। বড়মিঁয়া কাইন্দা উথাল পাথাল। বনবিবিরে চিনতি ভুল করলে সারাজীবন কানতি হয়। শাকিলার পিঠে চিবুক ঠেকিয়ে মুশা বলে—কানতি হয় তোর সাথে সারাজীবন কাইনব। হাল্কা বাতাসে ওড়ে মুশা মিঁয়ার নুড়া দাড়ি।

উজানে সম্পান নায়ের মাঝিরা বৈঠা ফেলে—হিও হো, হিও হো। শাকিলা মুশাকে পিঠে চাপিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করে উল্টো দিকে। হৃদয়ে তার অকূল দারিয়ার পানি।

এক দুই আড়াই

—হ্যালো .....

—হ্যালো বাবা, মা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাঁদো কাঁদো গলা ফোনের ওপারে। আঃ, বুকের মধ্যে ধরফরিয়ে ওঠে আকাশের। ইথার তরঙ্গে ভেসে আসা প্রত্যেকটি শব্দ হৃদয় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এই সেই দীপের মিষ্টি গলা? স্রেফ দীপের মিষ্টি গলা শোনার জন্য আকাশ অফিসের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ি ফোন করে। অনিষা কম ঠাট্টা করে এ নিয়ে—বাপ যেন কেউ আর হয় না! পিতৃত্ব যেভাবে সংক্রামিত হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্র না বনে যাও। আধো আধো গলার দিন থেকে দীপের ফোন ফোন খেলাটা একটা নেশা। দীপের সান্তাক্রোজ ঠাম আবিষ্কার ঐ করেই। সি.এল.আই.-এ আকাশের নম্বর ধরে ফেলেছিল সান্তাক্রোজ ঠাম। ১লা জানুয়ারী সাত সকালে কলিং বেলের শব্দ। দরজা খুলতেই ঘরের ভিতর ঢুকে পরলেন এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা। হাতে অনেক খেলনা, উপহার, লজেন্স। আকাশ-অনিষা অবাক। ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে বললেন, আমি নীতা গোমস, দীপের সান্তাক্রোজ ঠাম। দীপের যেন কত কালের চেনা ঠাম। সেই ছোট্ট দীপের কথাগুলো আকাশের কাছে অবোধ্য। বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছে অসংখ্য প্রশ্ন। সত্যিই কি সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল? অভিন্ন স্বেদগ্রন্থিতে লোনাক্ত হওয়ার আভাশ বইছে শরীরে।

আকাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। এস.ডি.ও. সাহেবকে বলে বেরুলে ভাল হত কিন্তু কি বলবে তাকে। অনেকগুলো প্রশ্ন আসতে পারে। তার চাইতে বরঞ্চ বলাইকে বলে যাওয়াই ভাল। কলিং বেল টিপল—বলাই, এস.ডি.ও. সাহেবকে বলো আমি জরুরী কাজে বেরুচ্ছি। দেরী হলে আজ আর ফিরব না।

বাসুর একটাই দোষ—গাড়ি কিছুতেই জোরে চালাবে না। বা এমনও হতে পারে স্টিয়ারিং হাতে গাড়ির নাড়ীর টান বোঝে। কোথায় ব্যথা, কোথায় উষ্ণতা। এস.ডি.ও. অফিসের ভাড়া গাড়ির বাসু মালিক কাম ড্রাইভার। বাসুর গাড়িতে উঠলে ঠিক জায়গা মতো পৌঁছানো যাবে অবশ্যই কিন্তু সময়ের কোন গ্যারান্টি নেই। আকাশের সবুর সইছে না। আরও জোরে চালানোর জন্য তাড়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে। পি.জি. হাসপাতালের সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল ট্রাফিক জ্যামে। এখান থেকে রেক বাগান পর্যন্ত গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রসদনের মুখ ঢেকে পায়ে পায়ে

দাঁড়াচ্ছে উড়ালপোল। কলকাতার বুগ্ন শিরায় উড়াল পাখা। এখানেই নাকি জন্ম নেবে গতি। বাসুর গাড়িটা যানজটে গোঙরাচ্ছে। গোঙরানিটা আকাশের মনের—অনিষা এভাবে প্রতিশোধ নেবে? এতক্ষণে কি সব কিছু শেষ হয়ে গেল। অসহায় লাগছে তার। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় একটা কথাও বলেনি অনিষা। প্রত্যেকটা কাজ করে গেছে যন্ত্রের মতো, ঠিকঠাক। দিনটা প্রতিদিন থেকে অনেকটাই আলাদা। অফিসে বেরুনোর সময়ের চোখের উষ্ণতার ভাষা কই? বলা কথা, না বলা কথা। অনেক লোকজনের মধ্যেও তাদের এ সময়টুকু বেরিয়ে যায়। সারা কলকাতায় এখন শুধু লালবাতির নিষেধ। সেই লালবাতি অগ্রাহ্য করেই লালবাতি গাড়ি চলে গেল। হুটারের শব্দ আছড়ে পরছিল পি.জি. হাসপাতালের পাঁজরে। আকাশের ভাবনায় ধাক্কা লাগে। মনে পড়ে যায় রাতের কথা—

—তুমি চাও না আমি বাঁচি। অনিষার অচেনা গলা।

—একি কথা! কিসের অভাব বোধ থেকে এমন কথা বলছ?

—অভাব বোধের কথা নয়। আর দশটা মেয়ে যা যা চায় সবই দিয়েছ তুমি। একটা সাজানো সংসার, ছেলে, বড় চাকুরী করা বর। আর এ সবের একটাই লুকানো শর্ত; আমাকে তুমি পুতুল হিসাবে দেখতে চাও।

—নিজেকে পুতুল ভাবছ কেন? সংসারে সীমাবদ্ধতা ছাড়া একটা মানুষও তুমি দেখাতে পার?

—পুতুল ভাবার কারণও তুমি জান। কিন্তু একবারও জানতে চেয়েছ চাকুরীতে যেদিন রেজিগনেশন দিয়ে এলাম, সেদিন মনের অবস্থা কেমন ছিল।

—দীপ তোমার পেটে ছিল। তুমি আর পারছিলে না। আর আমার যা আয় একটা ছোট্ট সংসার চালাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

—দীপ হঠাৎ করে এসে যাওয়ার অসুবিধা হচ্ছিল ঠিকই, তবে আমার থেকেও তোমার বেশী। রজনী মাসি চলে যাওয়ায় পেট, সংসার নিয়ে পারছিলাম না। তবু তুমি অন্য স্বামীদের মতো সেবা চাইতে, আমার চাকুরীটা তুমি সহ্য করতে পারতে না।

—একই কথা বারবার বলার মানে হয় না অনিষা। আকাশ সুইচ্‌টা অফ্ করে দেয়। অন্ধকারে মুখ ঢেকে যায় অনিষা-আকাশের।

—জানি একথা তোমার পৌরুষত্বে লাগে। ছয় সাত বছর আমার নিজের বলতে তাও কিছুটা ছিল। তখন আমার চাকুরী ছিল। তোমার মনে পড়ে—আমার রোজগারের পয়সার তুমি কিছু নিতে না। নিউ মার্কেট থেকে তোমার জন্য একটা ব্লেজার এনেছিলাম। তুমি বললে—বিয়ের সময় স্বামীকে অঙ্গীকার করতে হয় স্ত্রীর সব দায়িত্ব নেবে। তুমি ব্লেজারটা কোনদিন পড়লে না। তখন আমার পছন্দসই

দু-একটা শাড়ী কেনার অধিকার ছিল। অথবা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট। আমার পছন্দ, সুখানুভূতিগুলি খুবই ছোট ছোট। এ বাড়িতে সবই আসে অনেক বেশী বেশী। চাহিদার তুলনায় তা বেশীই। কিন্তু সবই তোমার পছন্দে। আমি নীরব দর্শক। আমার স্বাধীনতা, আমার ভূমিকা কতটুকু?

—তোমাকে দেওয়া জিনিসগুলির কোনটা খারাপ?

—এখানে মন্দ-খারাপের ব্যাপার নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে, ইচ্ছা অনিচ্ছার। ভাল লাগা না লাগার। আজ যা করলে তারপর ও বলবে আমার স্বাধীনতা আছে এ বাড়িতে? আমার নিজের বলতে কি আছে? প্রতিটা মুহূর্ত এভাবে দমবন্ধ অবস্থায় বাঁচা যায় না। আমার তো যাওয়ার কোনো জায়গা নেই—অনিষা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

বিকেলের ঘটনাটা মনে হতেই আকাশ মিঁইয়ে যায়। শিয়ালদায় টিকিট কাউন্টারের পাশে দু'টো লোক সিজনাল ফ্লাওয়ারের চারা নিয়ে বসে। আকাশের ধারণা ওর একটাও বাঁচে না। টিকিটের লাইনে আকাশ। পাশে দীপ-অনিষা। তারা পার্ক সার্কাস ময়দান থেকে সার্কাস দেখে ফিরছিল। দীপ তখনও বুঁদ হয়ে আছে জোকারদের কান্ড কারখানায়। অনিষার সার্কাস ভাল লাগে না। মনে হয় মানুষের চিড়িয়াখানা। বামন মানুষটার জন্ম দুঃখ অথচ তাকে জোকার সেজে সবাইকে হাসাতে হবে, নিজের কান্নাগুলো গিলে গিলে ফেলতে হবে। পেটের দায়ে নিষ্ঠুর পরিহাস। ফুলের চারার দিকে চোখ যেতেই অনিষা আকাশকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল—দেখ, দেখ কি সুন্দর অ্যাস্টারের চারা। পাখির মতো উড়ে গেল চারাওয়ালার কাছে। ডালা থেকে তিন-চারটে চারা বাছে। দাম তিন টাকা। অনিষার খুব পছন্দ। বারে বারে তিনটে টাকা চায় আকাশের কাছে। আকাশ টিকিট কেটে তাড়া দেয়—কি হল, চলো চলো। এসব গাছটাছ নিতে হবে না।

—টবে লাগাব। দেখবে খুব সুন্দর ফুল হবে।

—আরে চলো তো। পরে ভাল গাছ কিনে দেব।

অনিষা আকাশের দিকে তাকিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল চারাগুলি। শিয়ালদার জনঅরণ্যে নির্বাক অনিষা। অনুভূতির তন্ত্রীগুলি খান-খান হয়ে যাচ্ছে। রক্তায়িত হচ্ছিল বেদনার উৎস মুখগুলো। স্টেশনে মিষ্টি কণ্ঠে ঘোষণা হৃদয়পুরে গন্ডগোলের জন্য বনগাঁও লাইনে ট্রেন ছাড়তে দেরী হচ্ছে। সব আক্রোশ যেন ট্রেন লাইনের উপর। কারখানার গেটে তালা? রেল রোকো। নেতায় নেতায় হিস্যার লড়াই, মাসুল দিতে হবে ট্রেনকে। রাজা নেই তো, সবাই রাজা রাজার রাজত্বে।

গাড়িটা গোর্কিসদনের সামনে আবার দাঁড়িয়ে গেল। সারা কলকাতা যেন আকাশের বিপক্ষে। অথচ এমন তো কোনো কোনো দিন হয় একটাও ক্রসিং-

এ জ্যাম থাকে না। সেদিনটা ভাগ্য সহায় থাকে। আজ যেন কলকাতায় দাবার প্যাঁচ লেগে গেছে। গুডরিক টুর্নামেন্টের কালো গুটির দাপট। অনিষা কি কালো ঘোড়ার মুখে পরল? অসংখ্য কালো ঘোড়া লাফাচ্ছে টগবগ, টগবগ। দুই-আড়াই, এক-দুই-আড়াই। আনন্দ-কাসপারভ-এর ঘোড়ার মায়া নেই। দয়া নেই। মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘোড়া। আকাশের চোখে অন্ধকার নেমে আসে। সিতাই-এর কালো রাত্রিটার মতো। পলেস্তরা খশা পুরাণো সিডি কোয়াটার। বিদ্যুতের দেখা নেই দু'দিন। বাতাস নেই এক ফোঁটাও। সেগুনের পাতা পড়ছে দু'একটা ধুপধাপ। চমকে পাখি উড়ে গেল—কোয়াক-কোয়াক। ঘরের মধ্যে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—কে, কে তুমি—আকাশের ঘুম গোঙরানি।

—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, আমি চাপিলা বর্মন। চিনতে পারছেন না? সকালেই সারা শরীর দেখলেন—স্তন, নাভি, উর্বর-অনুর্বর জঙ্ঘা। এর মধ্যে বেবাক ভুলে গেলেন?

—না মানে আমার তো ওভাবে দেখাই কাজ। শরীরের বাইরের অংশে কোনো অত্যাচারের চিহ্ন আছে কিনা। ইনকোয়েস্টের রিপোর্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেই লিখতে হয়।

—পেলেন না তো, কোনো আঘাতের চিহ্ন। না পাওয়ারই কথা, সব মৃত্যু কি দাগ রেখে যায়। অনেক মেয়েকে জন্মাবার আগেই মেরে ফেলা হয়। তাও আমার ভাগ্য ভাল বছর বাইশ বেঁচে ছিলাম। তিলতিল করে দমবন্ধ অবস্থায় মারা হয়েছে আমাকে। জানেন আমার স্বামী আমাকে বুকে চেপে ধরে মেনি বিড়ালের মতো আদর করত। চোখ বুজে ভাবতাম আঃ কি সুখ! আসলে ওটাই ওর খেলা। আমি চারপাশে ঘুরঘুর করতাম। বিয়ের বুঁদ তখনও কাটেনি। ঘুরতে ঘুরতে কখন যে দড়িটা শেষ হয়ে গেল টেরই পাইনি। স্বামীর বাড়ি দক্ষিণ খোলা কিন্তু আমার ঘরে হাওয়া কই? দমবন্ধ অবস্থায় মরে গেলাম। এর ক্ষতদাগ পাবেন কোথায়? আপনি কি মনের দাগ দেখতে পান?

—বিশ্বাস কর, আমি চেষ্টার কসুর করিনি। তোমার আত্মীয় স্বজনেরও কোনো অভিযোগ নেই।

—ওরা জানত আমার মৃত্যুর কারণ। কিন্তু মরাদেহ সামনে রেখেও অনেক হিসেব নিকেশ হয়। মেয়ের মৃত্যুতে গরীব বাবার দু'বিঘা জমি প্রাপ্তি হয়েছে। মন্দ কি বলেন? স্বামীর দুয়ার খোলা। অপেক্ষা করছে আরেক মেনি বিড়াল। হা-হা-হিঃ হিঃ। খান খান হয়ে যাচ্ছে কালো রাত্রির অন্ধকার।

—তোমার কথার কিছু বুঝতে পারছি না—আকাশ গোঙরায়। শরীর ঘামে

চপচপ। অনি...অনিষা...

—তোমার কি হল ... অনিষা ধরফরিয়ে ওঠে।

আকাশ-অনিষাকে ছুঁয়ে দেখে। তবে কি স্বপ্ন দেখছিল? মনে হল তার পাশে একটা লাশ শুয়ে আছে। অনিষা বাদে কেউ থাকার কথাও নয়। আকাশের ভুল হচ্ছে না তো।

তোমাদের চাকুরীটা ভয়ানক বিশ্রি। ভদ্রলোকে করে, যত রাজ্যের মরা-পচা-ঘাটা, ঘুমানোর চেষ্টা কর। অনিষা আকাশের চুলে বিলি কেটে দেয়। ঘুম আসছে না কিছুতেই। কেমন উদাস হয়ে যাচ্ছে মন—চাপিলার বয়স ২০/২২ বছর। বিয়ে হয়েছে তিন বছর। বিয়ের সাত বছরের মধ্যে অপমৃত্যু হলে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে ইনকোয়েস্ট আবিশ্যিক। আকাশের প্রথম ইনকোয়েস্ট। চাপিলার নিটোল শরীর। সামান্য গ্যাজলা পুরো মুখটা পাল্টে দিয়েছে। শরীরে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। ভিডিও ক্যামেরায় তুলে রাখা হয়েছে মৃতার নগ্ন শরীর। এটা চাকুরীর নিরাপত্তার জন্য। কে চায় গোবিন্দ সাহা হতে। উপসংহার লিখতে হয়েছে সম্ভবত আত্মহত্যা। মানুষ আত্মহত্যা করে কোন দুঃখে? চাপিলার অবশ্য একটা কারণ ছিল। তার কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। মনুর সমাজে সেটাই অবলার অপরাধ। পুরুষ অন্তর্যামীর মতো হাসে। সে বেকসুর খালাশ। উপসংহার লিখতে গিয়ে প্রতিবারই হোঁচট খেতে হয়—হত্যা না আত্মহত্যা। ব্যবধানটা যেন ঝুলে থাকে সূক্ষ্ম সুতোয়। উত্তরবঙ্গে অপমৃত্যুর হারটা একটু বেশি। মহিষাল বন্ধুর গান গেয়ে যারা দুঃখ ভুলতে পারে তারা যে কেন মরে আকাশ কিছুতেই বুঝতে পারে না। ইতিমধ্যে তার অনেকগুলো ইনকোয়েস্ট করা হয়েছে। জটিল অনুভূতি গিলে খায় তাকে—গ্রাম্য সরল মেয়েদের মুখ চোখের সামনে বদলে যায়। যেন স্পষ্ট দেখতে পায় মেয়েদের শরীরে মৃতার মুক। তাহলে মেয়েরা কি মৃত মুখ নিয়ে জন্মায়?

—আব্বে শালা বাসু, গাড়িটা জন্মেও কি জোরে চালাতে পারিস না? আকাশ চিৎকার করে ওঠে। বাসু স্টিয়ারিং হাতে ঘাড় ঘুরিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে তাকায়। সাহেবকে কেমন অচেনা লাগছে। চোখ দু'টো টসটস করছে যেন বান ডেকে যাবে এক্ষুণি। বাসু জিজ্ঞেস করে—স্যার, শরীর খারাপ লাগছে?

—বাসু, অনিষার মুখটা কি পাল্টে গেল নাকি! আমার ওর মুখটা কিছুতেই মনে আসছে না—আকাশ ডুকরে কেঁদে উঠে। বাসু এসবের মানে বোঝে না। অনিষা ম্যাডামকে দু'একবার দেখেছে, কখনও কিছু মনে হয়নি। সব সময়েই হাসি খুশি চেহারা।

ইষ্টার্ন বাইপাশ দিয়ে অ্যাম্বাসাডার ছুটছে হু হু করে। লাইট পোস্টগুলি ছিটকে যাচ্ছে পিছনে। পার্ক সার্কাস-সাইন্স সিটি। হিডকো মোড়ে আসতেই পুলিশ আটকে

দিল সিগনালে, ভি.ভি.আই.পি. যাবেন সল্টলেকে। পুলিশ আছে সবখানে টিকিটিকির মতো। অনিষাকে নিয়েও কি ওরা ইতিমধ্যে টানা হিঁচরা শুরু করেছে। থানা-পুলিশ, মর্গ, খুবলে খাওয়া ধাড়ি ইঁদুর, ম্যাজিস্ট্রেটের তীব্র প্রশ্নবাণ—মৃতার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল? মানুষের সাথে মানুষের জটিল সম্পর্ক ম্যাজিস্ট্রেট কি দিয়ে মাপবেন? ডাক্তার ডোমে ফালি ফালি করে দেবে অনিষার নরম শরীর। অনিষার শরীরে কি একটু তাপ নেই। তবে কি পুরুষ হিসাবে কোনো উষ্ণতা দিতে পারেনি অনিষাকে। আকাশের শরীরে কাঁপুনি। গা গুলিয়ে ওঠে। গাড়ির কাঁচ ঝড়ের বেগে নামিয়ে দেয় সে—ওয়াক, ওয়াক। যেন রক্তবমি। ধমনী, পৌষ্টিকতন্ত্র উপরে আসতে চাইছে। রক্তহীন পাঙসুর আকাশ ন্যায়-অন্যায় বোধের কোনো হিসাব মিলাতে পারছে না।

বাড়িটা ভূতুরে বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে নিস্তব্ধ দুপুর গলিতে। তাদের ফ্ল্যাটটা তিনতলায়। আলিপুরে বদলির পরে কেনা, লিফট নেই। চার-পাঁচতলা বাড়িতে লিফ্‌ট থাকার কথা অথচ তাদেরটায় নেই। ফাঁক ফোঁকর দিয়ে গলে যায় আইন। আকাশের পা উঠছে না। হাঁটুতে মনে হচ্ছে খিল লেগে গেছে। লিফটের প্রয়োজনটা এবার বোঝা যাচ্ছে হাড়ে হাড়ে। তিনতলার মুখোমুখি ফ্ল্যাটটা এখনও ফাঁকা। কলিং বেলটাকে ভয় হচ্ছে আকাশের। কে খুলবে দরজা? অসহায় ছোট্ট দীপ হয়ত কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পরেছে। ঘরের মধ্যে বন্ধঘর। কিছু একটা করতে হবে আকাশকে। হঠাৎ করে তার হাতে দরজার কড়া পাগালি ঘন্টি হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে সাড়া শব্দ নেই। মুহূর্তগুলি বড় হয়ে যাচ্ছে—টিক, টি-ক, টি--ক।

অনিষা দরজা খুলে দেয়। দীপ মাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে উঁকি দিচ্ছে। অনিষার চোখে সেই উষ্ণ হাসি—কি মশাই, হা করে দেখছ কি। দীপকে ছেড়ে কোথায় যাই বলতো? মা-বাবার মাঝখানে দীপ। দু'দিকে দু'হাত বাড়ায়ে যেন সেতু।

তরাস

পাড়াটা বৈশ্বানরের ভাল লেগেছিল। মধ্যবিত্তের একতলা, দোতলা বাড়ি। কর্নার প্লট বরাবরই লোভনীয়। তার ভাগ্যে শিকে ছিড়বে ভাবতেই পারেনি বৈশ্বানর। এতল্লাটে জমি কোথায়, যা দু'একটা মেলে তা পুকুর ভরাট করা জমি। ঝুঁকি নেওয়ার দম নেই তার। মালিক-প্রোমোটার-দালাল-নেতা-ক্রেতার চেন। শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ক্রেতা, তার ধনে অনেকগুলো উটকো লোকের পোদ্দারি। সরকারি লোন নিতে গেলেই হ্যাপা। মিউটেশন, কনর্ভাসন আরও কত কি। অবশ্য লোক ওত পেতে আছে। ছাড় কড়ি মাখ তেল। টাকা ছড়ালে ওগুলো কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু তার ক্ষেত্রে এসব সামলাতে হয়নি বললেই চলে। জমির মালিক সরকার বাবুর সবই রেডি ছিল। সাবেক বাগান বাড়ির কর্নার প্লটের হাত বদল মাত্র। প্লটটির মাপ বিয়াল্লিশ বাই পয়তাল্লিশ। এখন বাগানবাড়িটার হতশ্রী দশা। যেন পড়ে যাওয়া যৌবনের মতো। অনেকটা জায়গা নিয়ে ছিল ঘোষ বাবুদের বাগানবাড়ি। দিনে পুকুরে ছিপ, রাতে ঝনক ঝনক পায়েল। বাবুরা যে কোথায় মিলিয়ে গেল ডোডো পাখির মতো। এখন হয়তো তাদের নাতি নাতনিরা নাইট ক্লাবে ফিরিঙ্গি, জল যৌবন তরঙ্গ। ঘোষ বাগানের একমাত্র প্লটটা বেচে দিয়ে সরকার বাবু চলে গেলেন দক্ষিন কলকাতায়, সেখানে ফ্লাট নিয়েছেন। সুখ পয়সায় মিললে কে চায় উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জিজীবন।

এখানেই বৈশ্বানর ব্যতিক্রমি, সে চায় মাটির সোঁধল গন্ধ। হাতে চাঁদ পাওয়ার মতোই জমিটা মিলেছে তার এক আত্মীয়ের কল্যানে। এযুগের অবিশ্বাস্য ঘটনা হল দালাল ফি লাগেনি।

গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে যেত, যদি না গলির মুখে ক্লাবটা থাকত। বাড়িতে হাত দিয়েই বুঝল অনেকগুলো উৎসুক চোখ তাকে কিছু বলতে চায়। ওরা সরাসরি এলো সেদিন সন্ধ্যার পর। বাড়ি তৈরীর সুবিধার জন্য পাশেই ভাড়া নিয়ে থাকত তারা। সামনের ঘরে জনা ছয়েক ছেলে। বেপাড়ার ও আছে দু'একজন। দাদা গোছের ছেলেটা শুরু করল এভাবে—কাকু, আমরা সবাই নবকুড়ি ক্লাবের সদস্য। ভালই হল আপনি আমাদের পাড়ায় বাড়ি করে আসছেন। আপনার ভালমন্দ দেখার দায় দায়িত্ব আমাদের ক্লাবের। আমাদেরও ছোট একটা আবদার আছে। ছেলেটি আবদারটি এমনভাবে জুড়ে দিল যেন পাড়ায় আসা ও ভাল থাকা না থাকা সম্পর্ক এক সুতোয় গাঁথা। কোনো একটি বাদ পরলেই ছিঁড়ে যাবে গোটা স্বপ্ন কল্পনা।

—যেমন? বৈশ্বানর আবদারের গভীরতা বোঝার জন্য ছেলেগুলোর দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে।

—সামান্য ব্যাপার। দেখেছেন তো ক্লাবের একতলা বাড়ি। সদস্য সংখ্যা অনেক। একতলায় আর পোষায় না। দরকার দোতালা। আমাদের ইচ্ছা আপনি খানিকটা করে দেন। আপনার সাপ্লাইয়ারকে বলে দেবেন, এক লড়ি ইট আর বস্তা ত্রিশ সিমেন্ট দিয়ে দেবে আমাদের ক্লাবে।

—এ্যা, বল কি? এক লড়ি ইট আর ত্রিশ বস্তা সিমেন্টের দাম কত জান?

—কত আর হবে, হাজার পনের। আপনার পক্ষে সামান্যই।

বৈশ্বানর কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হাজার পনের টাকা সামান্য। জমির লোন এখনও পুরোপুরি শোধ হয়নি। বাড়ি তৈরীর সরকারী লোনটা বরঞ্চ মিলেছে তাড়াতাড়ি। তাও রবিবাবুর কল্যানে। পূর্ব পরিচয় ছিল। অমুক বাবুর লোক তমুক বাবুর লোক হয়ে যেতে হয়নি। বৈশ্বানরের বেশ গর্ব হয়—আবেদন থেকে স্যাংসন, ট্রেজারি চেক ইত্যাদি মিলেছিল ঝড়ের বেগে এক মাসের মধ্যে। তার শুকতলা বেশ মজবুতই আছে। কিন্তু ব্যাংক পুষিয়েছে সময়। চেক কালেকশন দেড়মাস। সিষ্টেমটাই নাকি ওরকম। কালেকশন ফি, পোষ্টাল চার্জ সবই আছে সময়ের কোন গ্যারান্টি নেই। বৈশ্বানরের কাছে পনের হাজার মানে সুদে আসলে পঁচিশ হাজার। বৈশ্বানরের বলতে ইচ্ছা হয়—তোমরা কি ভাই এপাড়ার ইজারা নিয়েছ নাকি। একটা ফুটবল চাইতে পার বা ক্রিকেটের সাজ সরঞ্জাম, দিয়ে দেব স্বেচ্ছায়। পৌরসভা কোন ট্যাক্স নিতে বাকি রাখেনি। ক্লাবকেও দিতে হবে শান্তি চাঁদা? ক্লাব তার সদস্যদের উপরে কর্তৃত্ব ফলাতে পারে। প্রশ্নগুলি স্বাভাবিকভাবেই তার মাথায় আসে—কার প্রজা সে, রাষ্ট্রের না ক্লাবের?

বৈশ্বানর নিজেকে সংযত করে বলে—দেখ ভাই এত টাকা কোত্থেকে দেব, তোমাদের আবদার যতটা পারি মিটাব।

—আমরা কোন অন্যায় আবদার করিনি। এপাড়ায় ভদ্রলোকেরা থাকে। ভদ্রলোকের মতো কথা বলবেন। আমরা কম করেই চাই। অন্য পাড়ায় যেতেন বুঝতেন ঠ্যালাটা, ত্রিশ চল্লিশের নীচে কথা নেই।

—লোনের টাকা থেকে অতগুলো টাকা দেওয়ার মানে বোঝ?

—দেখুন দাদা, আপনার সাথে ফ্যাচর ফ্যাচর করতে আসিনি। পাঁচ সাত লাখের বাড়ি করবেন যত কান্নাকাটি ক্লাবের টাকায়। টাকা দিয়ে বাড়ির কাজে হাত দেবেন। ছেলেটা অনেকটা হুকুমের সুরে বলল। পরে বৈশ্বানর জেনেছিল সে ক্লাবের সভাপতি। এই বয়সেই চেহারার আড়ালে হিংস্র মূর্তিটা লুকিয়ে রাখার কৌশল রপ্ত করেছে। হয়ত তালিম দেওয়ার অনেক বড় কারিগর আছে।

গলির মুখে কুত্তাগুলো ঘেউঘেউ করবেই। নেড়ি কুত্তার যা স্বভাব। বৈশ্বানর আর ধীরুভাই এক গোত্রিয় হল নাকি? ভুজিওয়ালা থেকে ধীরুভাই আম্বানি, রিলায়েন্সের কর্নধর। তার গতি ছিল হাতির মতো, পিছনে নেড়ি কুত্তার চিল চিৎকার না শুনলেও চলত। একটা জায়গায় তার সাথে বৈশ্বানরের কিছুটা মিল—দু'জনেরই উত্তরণ কাহিনী প্রায় এক। মাটি থেকে উঠে আসা কিন্তু অমিল এই যে, বৈশ্বানরের উত্তরণ শূন্য থেকে একজন মাঝারি গোছের প্রশাসনিক অফিসারে। তার সীমাবদ্ধতা সে জানে। আর ধীরুভাইর অঙ্গুলি হেলনে টলে যেত সর্বশক্তিমান সরকার।

ক্ষমতা দেখাতে গেলেই বিপদ। খোলের মধ্যে শূন্য। ক্ষমতা না দেখানোর খেলাটা খেলে যেতে চায় বৈশ্বানর। ক্লাব থেকে ভেসে আসা আওয়াজ—বউ ছেলে নিয়ে পাড়ায় থাকা গুটিয়ে দেব। কত চড়ুই এলো গেল ফুরুৎ ফুরুৎ। হিমস্রোত নেমে যায় মেরুদন্ড দিয়ে। তবু বৈশ্বনারের মনে হয়—সৎপথে আয়ের পয়সা লুটের বাতাসা নয়। মগরা তো অনেক আগেই দেশ ছেড়েছে। মায়েরা যদিও ছড়া কাটে—শিশু ঘুমালো পাড়া জুরালো, বর্গি এলো দেশে। সহকর্মী সতীশদা বলে—ওসব নীতির ফ্যচফ্যাচানি ছাড়ো। মগের রাজত্ব সত্যিকারে কোনদিন গেছে নাকি? এযুগের তোলাবাজরাই আসল মগ। ভেকের রকম ফের। তোমার ওখানে ক্লাবের আড়ালে অন্যমুখ। তপসিয়া তিল্জলায় বাইকের দাপটে, বন্দুকের নলে। লড়তে যেও না। তলিয়ে যাবে। বোঝাপড়া করে নাও। বৈশ্বানর এসব নিজে বোঝে না তা নয়। মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মনের একটা ভূমিকা থাকে। কিন্তু সেখানেই তার অসুবিধা।

এমনই একটা গোটা বাড়ি চেয়েছিল নৈর্ঋতি। ফ্লাটের নীলসুখ তার পছন্দ নয়। বাড়ির সামনে একটু সবুজ, ম্যাজনাইনের ব্যালকনির কোনে ঝুলে থাকা অ্যালামুন্ডা। নৈর্ঋতির কাছে বাড়ি মানে দেয়াশলাইর বাক্সর উপর বাক্স নয়, ভিতর বাইরে দু'টো নিয়েই বাড়ি। বৈশ্বানরের কাছে আবদার করেছিল প্রত্যেক রুমের সাথে ব্যালকনি চাই। বৈশ্বানর কথা রেখেছে, খরচ একটু বেশী পড়েছে। নৈর্ঋতি চায় এমনই সুখি গৃহকোণ। খোলামেলা ঘর বারান্দা। ঘরে ঢুকতেই মস্ত ভুড়িওয়ালা নৃত্যরত গনেশ মহারাজ। সন্ধ্যায় সাঁঝের বাতি, টুংটুং ঘন্টার আওয়াজ। নৈর্ঋতি-বৈশ্বানরের ফেং শুই নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই। বৈশ্বানরের বক্তব্য ফেং শুই আসলে ভারতের বাস্তুতন্ত্রের চীনা সংস্করণ। বিদেশী ছাপে লাফিং বুদ্ধ। বাজার নঃ পরমং তপঃ। বুদ্ধ কি কখনও চীনে গিয়েছিলেন যে তাঁর হাসিতে চীনা বানিজ্য সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পরছে সারা বিশ্বে। তবে ভারত কেন পারল না?

বিয়ের সময় নৈর্ঋতির মনে একটু খুঁত খুঁত ছিল। ছেলের বাড়ি নেই। নৈর্ঋতির বাবার বক্তব্য এব্যাপারে একেবারে আলাদা। বাড়ি নেই তো করে নেবে। চাকুরি

ভাল হলে বাড়ি হতে ক'দিন, পাত্রই আসল কথা। গ্রাম থেকে বাবা চাকুরী সূত্রে উঠে আসার পর নৈর্ঋতিরা ভেসে বেড়িয়েছে ভাসা ফ্যানার মতো। অধিকাংশ সময়ই ভাড়া বাড়ীতে কাটানো। বাড়িওয়ালা প্রভূতুল্য। প্রভূর কথায় দ্বিমত হলেই হল—না পোষালেই অন্য বাড়ি দেখুন। ব্রহ্মাস্ত্র। দেখতে দেখতে মনে হত ভাড়াটিয়া আর মানুষ এক গোত্রিয় নয়। নিদেন পক্ষে সর্বহারার পরের শ্রেনী বিন্যাসে হওয়া উচিত ভাড়াটিয়া শ্রেনী।

নৈর্ঋতি সাজাতে চায় সংসার-বাড়ি। এক এক খানা ইট গাঁথার সাথে আনন্দের চোরা স্রোত বইত শরীরে। সকালে পাইপ দিয়ে জল দিতে দিতে নৈর্ঋতি ভেজা ইটে কান পেতে শোনে ইটের জল খাওয়া চিরচির শব্দ। নৈর্ঋতির রক্ত শরীরের রোমে রোমে বাড়ি আর রবীন্দ্রসংগীত। আনন্দধারা বহিছে ভূবনে। কিন্তু সুখ হলো জোনাকি আলো-অন্ধকারে ডুবে যাওয়া মায়া। বাড়ির দক্ষিন দিকের বারান্দা থেকে দেখা যায় আসরের মাঠ। শিশুদের মাঠ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তনুকে মাঠে পাঠানোর কথা ভাবতে নৈর্ঋতির ছড়িয়ে যেত এক স্বপ্নিল ডানা। ভাবনা গুঁড়িয়ে দিতে লাগল রাত। লালবাতি এলাকা সত্যি সত্যিই কি শহরতলীতেও ছড়িয়ে পরল! আসরের মাঠ রাতে কাঁপে শিৎকারে, মাটি ফুঁড়ে উঠা অসংখ্য শিয়ালের ভেঙচিতে। চারটা রাত ভয়ে সিটিয়ে থাকে মা-ছেলে। মাঝে মাঝে বাড়ির উপর ঢিল পড়ে দুপ-ধাপ। বৈশ্বানর উইক-এন্ডে শুক্রবার রাতে বাড়ি ফেরে। তাকে আঁকড়ে ধরে নৈর্ঋতি—এপাড়ায় এসে ভুল করলাম নাতো? কি বলবে বৈশ্বানর? বৈশ্বানর অনেক দেখা মানুষের একজন। প্রতিনিয়ত তাকে চেষ্টা চালাতে হয় কিছু না দেখার কৌশল শেখার। কিন্তু মনের মানুষটি তো আর চট করে মরতে চায় না। ইচ্ছা হয় তীব্র বেগে ফেটে পড়ে যন্ত্রনা, রাগ-অভিমান বেলুনের মতো বের করে দেয়। বাধা সময়, সামাজিক নিরাপত্তা, দ্বন্দ্ব—পেট নামক আদিম যন্ত্র। নৈর্ঋতি জানে বৈশ্বানরের কিছু বলার নেই। প্রত্যেকটা পাড়া, মহল্লা চলে গেছে তোলাবাজদের দখলে। নৈর্ঋতি এখন চোখের ভাষা পড়তে পারে। ছেলের স্কুল পথে শিতল কঠিন চোখের শাসানি—টাকা দাও, নয় বাড়ি ছাড়। না, এবাড়ি কিছুতেই নৈর্ঋতি ছাড়তে পারবে না। ইটে ইটে ঘাম ভালবাসা। ছেলে তনুকে এড়িয়ে বাথরুমে একটু একা থাকতে চায় নৈর্ঋতি। ঝরনার জল ভিজে যায় কান্নায়। কোথায় রবীন্দ্রসংগীতের আনন্দধারা। দুয়ার ভাঙা ঝড়ে মাটির গন্ধ খুবলে খাচ্ছে চিল।

—ও বৈশ্বানর, উতাল হাওয়া কোথায়?

বৈশ্বানর একেবারেই সমঝোতার চেষ্টা করেনি তা নয়। ক্লাব সদস্য সারথি বোসকে ধরলে ভেবেছিল কাজ দেবে। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার বড় ঘরের ছেলে, প্রমোটিং-এর ব্যবসা করে, বোম্বাটে মার্কা ছেলেদের থেকে একটু আলাদা তবে

ওঠা বসা ওদের নিয়েই। সারথি বলটা ঠেলেছিল রিজু নায়েকের কোর্টে—দাদা, আমি ব্যক্তিগতভাবে এসবের বিরুদ্ধে। আর আপনিও ক্লাবকে টাকা দিতে বাধ্য নন। আপনি একটা কাজ করুন, রিজুদার সাথে কথা বলুন। উনি আমাদের ব্যাপারগুলি দেখেন। বৈশ্বানর আগেও শুনেছিল রিজুবাবুর হাতেই সব পুতুলের সুতো। রিজুবাবু এক সময়ের দাপুটে নেতা। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে এখন খানিকটা বেকায়দায়। তবু হাতির দর তো আর সহজে পড়ে না। রিজুবাবু দু'জন লোকের সাথে কথা বলছিল পার্টি অফিস চেম্বারে—ঠিক আছে রাধাবাবু, আমরা কিন্তু এভাবে ভাবি না। প্রশাসনের স্বচ্ছতা থাকুক আমরা চাই। ব্যক্তি নিয়ে আমাদের দল না। আমি ও চাই না প্রশাসন আপনার অন্যায় আবদার মেনে নিক। লোক দু'টি চলে যেতে বৈশ্বানরকে ইঙ্গিতে ডাকল রিজুবাবু—হ্যাঁ বলুন। বৈশ্বানর নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—সারথি পাঠিয়েছে। নবকুড়ি ক্লাব আমার কাছ থেকে এক লড়ি ইঁট আর ত্রিশ বস্তা সিমেন্টের দাম চেয়েছে।

—ও আপনি সেই বৈশ্বানরবাবু! হ্যাঁ সারথি আপনার কথা বলেছে। আড়চোখে রিজুবাবু তাকে মাপলেন।

—ওরা টাকা না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ির কাজ বন্ধ রাখতে বলেছে। এর মধ্যে অনেক ইঁট, রড চুরি গেছে।

—না-না, আপনি কাজ চালিয়ে যান, আমি দেখছি। বাড়ি করতে গেলে ছোট খাট চুরি টুরি হয়। রিজুবাবু সিগারেট ধরাল।

—আর টাকার ব্যাপারটা?

—টাকাটা আপনাকে দিতে হবে। আপনার ভাললাগা না লাগা মতনই তো সব কাজ করতে পারবেন না। কিছু সামাজিক রীতিনীতি আছে, নাকি? সিগারেটের ধোঁয়ায় রিজুবাবুর মুখ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল—ছেলেরা সারা জীবন কাঠি চুষবে না। আপনার না হয় চাকুরী আছে। সারথি বলছিল—আপনি নাকি পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন। পুলিশ আপনাকে আজ-কাল-পরশু প্রটেকশন দেবে। তারপর? আমরা জানি কার কতটুকু ক্ষমতা। ঠুঁটো জগন্নাথ হতে ক'দিন লাগবে? ধোঁয়ায় রিজুবাবুর মুখ আর চেনা যাচ্ছিল না। গত পৌষ পাবনের মেলায় তনু একটা মুখোশ কিনতে চেয়েছিল। সারা মেলায় লাদেনের মুখোশ ভর্তি। অন্য কোন মুখোশ ছিল না, পছন্দ হয়নি বৈশ্বানরের। বৈচিত্রের অভাব। বৈশ্বানরের মাথা ঘুরে যায়—এখানে এত মুখ-মুখোশ! পাহাড় জঙ্গল খুঁজে বুশ যে কি পেল, লাদেন আছে লাদেনের মুখোশের আড়ালে।

—উপড়ে ফ্যাল সব গাছ। শালা বাড়ি করে ভেবেছে শিকড় গেড়েছে। এই সপা—সাইকাস গাছটা টব সুদ্ধ গুঁড়িয়ে দে।

বাইরে শোরগোল শুনে তিনজনই প্রায় দৌড়ে এল সামনের বারান্দায়। চোখের সামনে অ্যালামুন্ডা গাছটা হ্যাচকা টানে নামিয়ে দিল কার্তিক। গাছ ভর্তি হলুদ ফুল। অনেক কুড়ি ফুটি ফুটি। চোখের নিমিষে সে পিষে দিল মাটিতে। সপা-কার্তিকরা জনা সাতেক ছেলে তান্ডব চালাচ্ছে। ছোট সাজানো বাগানটা দলে মুচড়ে পিশে দিল। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ক্লাবের ছেলে। অন্যরা স্থানীয় স্ট্যান্ডের অটোওয়ালা। বেশ কিছু ছেলে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের ধ্বংসলীলা। ক্লাব সদস্য গৌরাঙ্গ হাত তুলে নির্দেশ দিচ্ছে—শালা ভিখারির বাচ্চা, পূজার ফুল তুলেছিল বলে মাকে বলে কিনা চোর। হুরকো দিয়ে দেব।

রোজ সকালে কে বা কারা ফুল তুলে নিয়ে যায়। জবা গাছটায় মস্ত একটা কুড়ি উঁকি দিচ্ছিল শনিবার বিকালে। প্রথম কুড়ি, শিহরণটাই আলাদা। নৈঋতি, বৈশ্বানরের মধ্যে স্রষ্টার অনুভূতি। মনে হয় ছোট্ট ছোট্ট তনু হাসে। নৈঋতি বলেছিল—জবাটা কাল ফুটবে, তাড়াতাড়ি উঠলে দেখতো কে ফুল তোলে। রবিবার সকালে অন্ধকার থাকতেই বৈশ্বানর হাতে নাতে ধরে ফেলেছিল চোরটাকে। মহিলা ফুলচোর। তা হলে কি চুরির ফুলে দেবতার পূজো। অবশ্য এটাই তো স্বাভাবিক—অসাধু ধন সম্পত্তির মালিকরাই বড় বড় পূজারী। দেবতারা জাকজমক পছন্দ করেন।

—আরে পাঁচিল টপকে ফুল চুরি কর, ব্যাপার কি? গাছের প্রথম ফুলটাই তুমি তুললে? আর এদিকে এসো না কখনো। তখন জানত না মহিলা কে। পরে শুনেছে সে গৌরাঙ্গর মা। ফুল তুলে বাজারে বিক্রি করে। একে বারে সখের চোর নয় যে চুরির ফুলে ঠাকুরের পূজা দেবে। গৌরাঙ্গর কথায় হামলার সূত্র খুঁজে পায় বৈশ্বানর। ক্লাব মওকা পেয়েছে। টাকা দাও নয় বাড়ি ছাড়। সবটুকু ভয়ভীতি গৌরাঙ্গরা ঝেড়ে ফেলেছে। ছেলেগুলোকে আর চেনা মনে হচ্ছে না। বৈশ্বানরের মাথা কাজ করছে না, কি করবে সে? আশেপাশের বাড়ির জানালা ধপাস ধপাস করে মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। অথচ সবার নাকি করুণ অভিজ্ঞতা আছে। জমি বাড়ি কেনার সময় সকলে মাথা মুড়িয়ে এসেছে। স্রোতের উল্টোদিকে একা হাঁটা যায় না। নৈঋতির চোখ ফেটে কান্না আসতে চাইছে। ঠোঁট কামড়ে গিলছে কান্না। দু'হাতে গ্রিল ধরে আছে তবু সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। মরিয়া হয়ে বৈশ্বানরকে ঝাঁকিয়ে দেয়—কিছু একটা কর, পুলিশকে খবর দাও। তনু ভয়ে ছুটে পালিয়েছে ঘরের মধ্যে।

—আরে শোন সপা, মুরগির খাঁচা থেকে পুলিশ দেখাচ্ছে। দেতো শালীর দরজা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দে। কাঠের দরজার উপরে জোড়া পায়ের লাথি, দরাম দরাম। থরথর কাঁপার শব্দ। যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে যাবে কাঠের দরজাটা। বেনো জলের

মতো ঢুকবে গৌরাঙ্গর দলবল। নবকুড়ি ক্লাবের ছেলেরা। বৈশ্বানরের সাথে তাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। নিমিষে তছনছ হয়ে যাবে গোটা সংসারটা, নৈর্ঋতির স্বপ্নসুখ।

নৈর্ঋতির বুক ফেটে যাচ্ছে। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছে না। বৈশ্বানর কিছু বুঝে উঠার আগেই দরজা খুলে বানের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরল নৈর্ঋতি। দু'হাতে ফাঁসের মতো জাপটে ধরেছে গৌরাঙ্গর গলা। নৈর্ঋতির মরণ কামড়। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। হাত দু'টো আরো কষে ফাঁসের গিরা হয়ে যাচ্ছে। অন্য ছেলেরা হতচকিত। জানালায় মাথা চাপা পড়া টিকটিকির মতো গৌরাঙ্গর অবস্থা। তীব্রবেগে লেজ নাড়ছে বেড়িয়ে আসার জন্য। পৌঙ্গব মূর্তি নেই। শুধুই ভ্যা-ভ্যা। যেন মহিষাসুর মর্দিনী নারীর অতর্কিত আক্রমনে শত্রু শিবির ছত্রখান।

ঠিক সেই সময়ে পুলিশ জিপটি এসে থামল বাড়ির সামনে। ইন্সপেক্টর লাফিয়ে নামল জিপ থেকে। জিপ দেখেই কার্তিক, সপারা পালাল। কিন্তু ক্লাবের অনেক ছেলে তখনও আছে। তারা সামনে এসে বলল—স্যার, বদমাসটাকে বৌদি ধরেছে। আগে ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। হাড় গোড় গুঁড়িয়ে দেব। ওদের জ্বালায় ক্লাবে টেকা দায়। ক্লাবটা বানিয়ে ফেলেছে এন্টিসোসালদের ডেন। ওদের আর ক্লাবের ধারে ঘেঁসতে দেব না।

ইন্সপেক্টর নৈর্ঋতির কাছে গিয়ে বলল—বৌদি ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। আমি দেখছি তোলাবাজটার কত ডিগ্রি লাগবে। ইন্সপেক্টর গৌরাঙ্গর চুলের ঝুঁটি ধরল।

বৈশ্বানর ততক্ষনে ছেলের হাত ধরে নৈর্ঋতির কাছে চলে এসেছে। তাকে দেখেই ইন্সপেক্টর চিনতে পারল—স্যার, চিনতে পারছেন। বশিরহাটে আপনার সাথে ডিউটি করেছি। আমাদের আগে জানালেই পারতেন। ব্যাটারা ভেবেছে কি? প্রশাসন মরে গেছে নাকি।

নৈর্ঋতি গৌরাঙ্গকে ছেড়ে দিয়েছে। তনু দৌড়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। গৌরাঙ্গ মাথা নিচু করে হাঁপাচ্ছে। ইন্সপেক্টর রক্তিমবাবু গৌরাঙ্গকে জীপে তুলতে গেল—

—না, ইন্সপেক্টর ওকে ছেড়ে দিন—নৈর্ঋতি বলল।

—বলছেন কি ম্যাডাম?

—হ্যাঁ আমি বলছি, ওকে ছেড়ে দিন। নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।

নৈর্ঋতি এখন মানুষের স্পন্দন মাপতে পারে। বুঝতে পারে হাওয়ার বেগ। গলির জানালাগুলি একে একে খুলে যাচ্ছে। নৈর্ঋতির শরীর জুড়ে নরম মেঘের স্বর। সে কি আগে কখনও জানত জয়ের অনুভূতি শরীরকে এমন আপ্লুত করে।

মধুচক্রে একদিন

এক

লোকে বলত ঘোড়ারোগ। হ্যাঁ, প্রায় ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখত সে একজন মাল্‌টিন্যাশনাল কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্‌ হবে। চালচুলোহীন যুবকের এমন কল্পনায় পরিচিতরা হাসত। কিন্তু তার লক্ষ্য স্থির অবিচল। নিজেকে ঘোড়া ভাবতেও দ্বিধা ছিল না তার। একটাই দ্বন্দ্ব ছিল তার, গতির স্বচ্ছতা রেখে শিখরে পৌঁছানো যাবে কিনা। সে বরাবরই জানত পেশীশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির মধ্যে পার্থক্য এবং অলঙ্ঘনীয় যোগসূত্র আছে। যোগসূত্রটাই খুঁজে বের করেছিল বছর চুয়াল্লিশের যুবক সুজাত। মিঃ সুজাত গুহ এখন একজন বহুজাতিক সংস্থার বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্‌।

ইন্টারকমের ওপারে সুন্দরী পি.এ.'র গলা—স্যার, এক ভদ্রমহিলা আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

—নাম কি? ... নাম বলছে না। ... কেন দেখা করতে চায় কিছু বলেছে? ... আচ্ছা পাঠিয়ে দাও।

সুজাত তাদের কোম্পানীর ভারতে আর একটা প্রস্তাবিত প্রজেক্ট রিপোর্ট পড়ছিল। সিস্টার কনসার্নের ফিউচার প্রফাইল তাকেই তৈরি করতে হবে। যদিও প্রত্যেক ডিরেক্টরের মতামতের সমান গুরুত্ব। তবু সুজাত জানে তার রিপোর্টই চূড়ান্ত। কারণ তার মতো বাজারের গতিপ্রকৃতি, নাড়ি নক্ষত্র আর কেউ স্টাডি করতে পারে না। তার চোখের মধ্যে ভোক্তা চাহিদার লেখচিত্র আঁকা হয়ে যায় প্রতিনিয়ত।

দরজা ঠেলে বছর পঁয়ত্রিশের এক ভদ্রমহিলা ঢুকল। ক্রিম রঙের চেহারা। হাল্কা মাখন সিল্ক শাড়ীতে ভেসে যাচ্ছে তার পুষ্ট শরীর। চোখের কোণে সামান্য কালি, যেন ক্লান্ত উদাসীন চোখ। তবু এখনও প্রথম দর্শনে যে কোনো পুরুষের চোখের তারা নেচে ওঠার মতো সুন্দরী। সুজাতের খুব চেনাচেনা মুখ। অথচ লিঙ্কেজটা মাথায় আসছে না কিছুতেই।

—আমি শতরূপা মৈত্র।

এক লহমায় পনের বছর পিছনে ফিরে গেল সুজাত। তখন সে কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজার মিঃ দাসের সি.এ.। নামে সি.এ. হলেও মূল কাজটা হল দাস

সাহেবের ফাই ফরমাস খাটা। মেয়ের ভর্তির সময় কলেজে কলেজে ফর্ম তোলা। আর তার বউকে তুষ্ট রাখা। দাস সাহেবের অনেক গোপন ব্যাপার স্যাপার জানত সুজাত। আবার বিভিন্ন মাধ্যম থেকে ইনফর্মেশন যোগানোর ব্যাপারেও সে সিদ্ধহস্ত। সে কাজগুলো এমন সুচারুভাবে করত যে সব সাহেবই চাইত সুজাতকে সি.এ. হিসাবে। সেদিন বিকালে ডাক পড়ল চিফ মার্কেটিং ম্যানেজারের চেম্বারে। নর্থ ব্লকে দোতলায় বিশাল এ.সি. চেম্বার। চিফ সুজাতকে বেশ খাতির করেই বসতে বলল—বুঝলে সুজাত আমাদের কোম্পানীর সামনে বিরাট প্রোসপেক্ট। তা প্রায় দু'আড়াই কোটি ডলারের কনসাইনমেন্ট।

—স্যার।

—সাপ্লাই অর্ডারটা পেলে কোম্পানী একটা আলাদা জায়গায় চলে যাবে। তুমি আমাদের এ ব্যাপারে অনেকটা হেল্প করতে পার।

—স্যার, আমি! সুজাত অবাক হল।

—স্পেন থেকে থ্রি মেন এক্সপার্ট টিম আসবে। তোমাকে তাদের রিফ্রেসমেন্টের ব্যাপারটা দেখতে হবে।

—স্যার, আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

—কাম অন ইয়ং ম্যান। অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ জন্মায় না। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সবাইকে একদিন শুরু করতে হয়। তুমি পারবে। আমরা শুনেছি তুমি স্প্যানিশটাও মোটামুটি রপ্ত করেছ। ইয়োর কমুনেকেটিভ স্কিল ইস বেটার দ্যান অ্যানি বডি এলস্। ইউ ক্যান টেক হেল্প অফ ত ানি থিং। ইনক্লুডিং থ্রি ম'স। এই দত্তকে চেন? ও সব দিক সামলে নেবে। দত্ত ধুতিটা ছাড়ল না আর ইংরাজি শিখল না। নইলে...।

দত্তকে কে না চেনে। কোম্পানীর সাহাগঞ্জ ইউনিটে পেছনে সবাই তাকে শেয়াল বলে ডাকে। সে নিজেও সে কথা জানে। কিন্তু দত্ত কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে শোনা যায়নি। মাস্টার রোলে দত্তর নাম আছে। বেতন সামান্যই। কিন্তু তার দ্বার অবারিত। দত্তবাবুর কাজটা যে কি কোনো শ্রমিক জানে না। দেখা হলে সবার সাথে হেসে কথা বলতে বলতে ফুরুৎ। কোথায় যে হাওয়া হয়ে যায়। হাওয়ায় হাওয়ায় বোধ হয় লোকটা জেনে যায় কোম্পানীর নাড়ী নক্ষত্র। লোকটার গায়ে মেদ লাগল না একটুও কোনোদিন অথচ তার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স স্ফীত হয় প্রতিনিয়ত।

দত্তবাবু ব্রান্ড নিউ কন্টেসা গাড়ি থেকে নামতে নামতে একগাল হেঁসে বলল—চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন ভায়া। এমনিতেই লোকটার উপর রাগ হচ্ছিল। তিনটে থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে। যাদের আসার কথা ছিল তাদের পাত্তা নেই। তার উপর উল্টো প্রশ্ন। সুজাত একটু ভারী স্বরে বলল—দাদা আপনার কলগার্লরা কোথায়?

দত্ত মুখের উপর আঙুল চেপে বলল—চুপ চুপ। ওভাবে কথা বলো না। কেন দেখতে পাচ্ছ না ওদের? সুজাত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তেমন কেউ নেই। একটু দূরে অবশ্য তিন যুবতী। ক্যাট ক্যাট চেহারা। বেশ অভিজাত ঘরের মেয়ে। এরা মোটেই বাজারী মেয়েছেলে হতে পারে না। দত্তবাবু সুজাতের অবস্থা বুঝে সুবেশা নারীদের ডাকল ইশারায়। পার্ক স্ট্রীটের এই জায়গাটায় অনেক মেয়েদের হাঁটাচলা র‍্যাম্পে হাঁটার মতো। দত্তবাবুর ইশারা পেয়ে মেয়ে তিনটি প্রায় বিউটি কনটেস্টের ঢং-এ এগিয়ে এলো। সুজাতের চোখ ছানাবড়া। দত্তবাবু সুজাতকে হাল্কাভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল, এ হল মিস্ দেবলীনা সেন, মিসেস ভাস্বতী সরকার আর মিস্ শতরূপা মৈত্র। আর এই লাজুক ভাইটি হল সুজাত গুহ। হোটেলে তোমাদের কাজ বুঝিয়ে দেবে। তাহলে চলি। দেবলীনা এগিয়ে এসে দত্তবাবুর চিবুক নাড়িয়ে দিয়ে টুক করে গালে চুমো খেল—সোনা দত্তদা। দত্তবাবু হাসি মুখে ফুরুৎ। সুন্দরীর হাটে সুজাত একা কুম্ভ।

কন্টেসা গাড়িটা ছুটছে পার্কস্ট্রীট ধরে ই.এম. বাইপাশে একটি ফাইভ স্টার হোটেলের দিকে। উত্তরআধুনিক তিন রমণী ইয়ার্কি ঠাট্টায় মশগুল। এদের মধ্যে কেউ পূর্বপরিচিত নয় অথচ কতকালের যেন সখ্যতা। এই মশগুলতায় হাড়কাটা গলির দৈন্যতা নেই। যদিও কাজ সেই আদিম কাল থেকে একই, পুরুষদের মনোরঞ্জন। ফাইভ স্টার হোটেলের এ.সি. স্যুট আর নিষিদ্ধ গলির স্যাঁতসেঁতে ঘরের যা পার্থক্য। গাড়ির ভিতরে ব্যাক মিররে ভেসে উঠেছে শতরূপা মৈত্র। শরীরের সবটাই যেন মাপা, টিকালো নাক, তীক্ষ্ম চোখ। ক্রিম রঙের স্কিনটাইট থ্রি ফোর্থ ট্রাউজার। হাল্কা লাল সাদা প্রিন্টেড টপ। গাড়ির আয়নায় নাভিমূলের মাদকতায় আটকে গেছে সুজাতের চোখ। সুজাতের বিশ্বাসকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এক একটা প্রশ্ন— কিসের টানে ছুটছে এরা। শুধুই টাকা? না জৈবিক চাহিদা পুড়ে ছারখার করে দিচ্ছে সমাজ। তবে এটা ঠিক বীরভোগ্যা পৃথিবী, ধনীভোগ্যা সুন্দরী। সুজাতের মধ্যে অভাবের হা-হুতাশ তীব্র হয়। এখন মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকে বড় ক্লিসে মনে হয় তার।

জীবন একটা ওত পেতে থাকা শিকারী, সুযোগের আশায়। সুযোগ আসবেই কোনো দিন। যোগ্য জহুরী চিনে নেয় মুহূর্তটা। প্রথম আসা সুযোগ। উন্নতির সিঁড়ি যেন পাতাই ছিল, সুজাত শুধু পা মিলিয়েছে। সিঁড়ির প্রথম ধাপ শতরূপা মৈত্র তার সামনে দাঁড়িয়ে। সেই রূপের আগুন—

—আহা দাঁড়িয়ে কেন? প্লিজ সিট ডাউন।

—যাক, চিনতে পেরেছেন।

সুজাত কলিংবেল বাজাল—কোল্ড অর হট?

—অ্যজ ইউ লাইক। স্মিত হেসে শতরূপা বলে।

সুজাত বেয়ারাকে দু'টো কোল্ড কফি দিতে বলল। বেয়ারা চলে যাওয়ার পর তার চোখ সরাসরি শতরূপার চোখে—

—কেমন আছো বল।

—আপনারা যেমন রেখেছেন।

—আমরা রাখার কে? যে যার জীবন বেছে নেয়। আমার শুধু জানতে ইচ্ছা করছে স্বনির্বাচিত জীবন কেমন চলছে।

—আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার কোনো অভাব আছে? গাড়ি, বাড়ি, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সবই আছে। প্রথম যে দিন আমাকে ট্রিপল সিক্স নং স্যুটে পাঠালেন সেদিনও কিন্তু আমার কোন অভাব ছিল না। অন্তত আমার না হোক বাবার সবই ছিল। কিন্তু শরীরে লাভার মতো লকলকে যৌন চাহিদা ছিল। আর তখনই এলো অফারটা। খোদ ইটালিয়ান মার্সেন্টের বিছানায় রাত কাটাব ভাবতেই কেমন আচ্ছন্ন হয়েছিল আমার ভালমন্দ বিশ্বাস বোধ। কিন্তু এখন অসংখ্য অনুভূতি দিয়ে এটা অন্তত বুঝেছি স্বদেশি খাদক আর বিদেশি খাদকে পার্থক্য নেই। ছিঁড়ে ঘেঁটে দেয় সাজানো বাগান। অথচ এরপর আর ফেরা যায় না, প্রস্টিটিউটের মতো চোখ রাঙানো মাসল্‌ম্যান হয়ত নেই কিন্তু জাঁকজমকের নেশা পেয়ে বসেছে সারা শরীরে। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষগুলোর মুখোশের আচ্ছন্ন করা টান কেউ অস্বীকার করতে পারে? শরীরের রোগ আস্তে আস্তে মরে যায়। অত অল্প পরিশ্রমে মোটা টাকা আয়ের রাস্তা কেউ ছাড়তে পারে না। আর টাকাই তো পাল্টে দেয় চারপাশটা। স্বামী সংসার পেতে, সন্তান উৎপাদনে কোনো অসুবিধা নেই। শুধু একটা নষ্ট শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় এই যা। হাড়কাটা গলিতে যারা সস্তা রঙ মেখে দাঁড়ায় তাদের থেকে আমি নিজেকে আলাদা বলে মনে করি না।

শতরূপার দীঘল চোখের কোণে আর্দ্র চিক্‌চিক্। শতরূপার সুখী চেহারায় ফুটে উঠেছে দহনের যন্ত্রণা। সে কি নিজের কথা বলে হাল্কা হতে চায়। না কৈফিয়ত চাইতে এসেছে? সুজাত ভিতরে ভিতরে মিঁইয়ে যায় আত্মগ্লানিতে।

--না মিঃ সুজাত, যা ভাবছেন তা নয়। আমি কোনো কৈফিয়ত চাইতে আসিনি। আমি তো কচি খুকি ছিলাম না। জিও ফিজিক্স নিয়ে এম.এসসি. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছিলাম। পৃথিবীর উত্তাপের কারণ জানতাম, অথচ নিজের শরীর মনকে চিনতাম না তা কখনও হয়? আর দত্তবাবুদের দেখছেন না, তারা আমাদের মতো সেক্সি গাইদের শরীরের হিট মেপে বেড়ায় মোটা টাকার লোভে। আসলে আমরা আমাদের শরীরের কাছেই বিকিয়ে যাই। যাকগে এবার বলি কেন এসেছি।

সুজাতের মুগ্ধ চোখ বর্ণময় শতরূপাকে তখনও চেখে যাচ্ছে প্রথম দিনের মতো।

শতরূপার কথাগুলো খুব একটা যে তার কানে গেছে তা নয়, তবু সুজাত খানিকটা সতর্ক।

—জানি আপনার এ জায়গায় আসার প্রথম ধাপ ছিলাম আমরা। কিন্তু সুজাত বাবু, আগুন নিয়ে খেলে হাত পোড়ায়নি এমন লোক সারা দুনিয়ায় কিন্তু কম আছে। আমরা যত মুল্যবোধ হারাচ্ছি ততই চারপাশের পরিধি ছোট হয়ে আসছে। হয়ত লালবাতি এলাকা ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলছে সিভিল এরিয়াগুলোকে। একটু সাবধান থাকবেন। সুজাতকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে পড়ল শতরূপা। শতরূপার গ্রীবায় তখন আটকে আছে সুজাতের চোখ। সুজাত হয়ত জানে না মস্তিষ্কে চর্বি জমলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়।

দুই

গাড়ি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল কৌরিতা কোনো কারণে ক্ষেপে রয়েছে। জানালার কাঁচ ভেঙে ফ্লাইংসসারের মতো উড়ে আসছে কাপ ডিস। গোটা বাংলোয় নিজেদের লোক বলতে কৌরিতা একা। সুজাতের বাবা-মা নারকেলডাঙায় ঘিঞ্জিতে থাকে এখনও। সুজাতের চার একরের উপর অট্টালিকা বাংলোয় নাকি তাদের দমবন্ধ হয়ে আসে। বড়লোক সন্তানদের বাংলোয় গরীব বাবা মা-দের দমবন্ধ হওয়ার গল্পটা সেই প্রাচীন। দু'পক্ষেরই সুবিধা, বাবা-মা পালিয়ে বাঁচে আর সন্তানরা আওড়ে যায় মুখরক্ষার গল্প। কৌরিতারও কোনোদিন সুজাতের বাবা মাকে কালচার্ড মনে হয়নি। আর সার্ভেন্টস কোয়াটার্স-এ কুক, আর্দালীসহ অনেকে থাকে। সবাই মিলে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় সাহেব বিবির মর্জির ভয়ে। নির্ঘাত তাদের কোনো একজন চটিয়েছে কৌরিতাকে। দু'তিন বার বেল বাজাতে কৌরিতাই দরজা খুলে দিল। দরজা থেকে অনেকটা দূরে শামুকের মতো গুটিয়ে আছে অ্যাটেনড্যান্ট সবিতা। কৌরিতার রুদ্রমূর্তি ঠাণ্ডা করার জন্য সুজাত বলল—শান্তি শান্তি।

—রাখো তোমার শান্তি। ওকে আমি মেরেই ফেলব। তোমার বেলজিয়াম ডিনার সেটের একটা ডিস ভেঙে ফেলেছে। সুজাতের হাসি পেল কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। একটা ডিসের বদলে ক'টা গেল তার হিসাব আছে। মুখে কিছু বলল না—আচ্ছা আমি দেখব। ডাইনিং রুমে চলো। তুই দাঁড়িয়ে আছিস এখনও, যা এখান থেকে। সবিতার ধড়ে প্রাণ এলো, এক ছুটে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

কৌরিতার এ অসহিষ্ণু আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিল না সুজাত। বিয়ের আগে থেকে কৌরিতা এন.জি.ও.-র আংশিক সময়ের উপদেষ্টা। তারা মানব সম্পদ উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে। আয় অনেক। সুন্দরী মেয়েদের গাঁটে পয়সা থাকলে ধরা পড়ে ঠাটবাটে। কৌরিতার ঠাটবাট, আর বাইরে কাজ নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামায়নি

সুজাত। ব্যক্তিস্বাধীনতা বা নারীস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হতে পারে ভেবেই হয়ত সযত্নে এড়িয়ে গেছে কৌরিতার কর্মজগৎ। কৌরিতার আচরণে সুজাতের মনে কেমন খটকা লাগে। সামান্য একটা বেলজিয়াম কাঁচের ডিস্ ভাঙতেই গুঁড়িয়ে যাবে মানব সম্পদ উন্নয়নের সব মডেল?

সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুজে রয়েছে কৌরিতা। এ.সি. চললেও অদ্ভুত ধরণের গুমোট অনুভব করে সুজাত। দক্ষিণা কাঁচের জানালা খুলতেই এক ঝাপটা হাওয়া ঢুকল ঘরে। সুজাত সোফার কাছে গিয়ে বলল—কৌরি, চলো নাইট ক্লাবে যাই।

কৌরিতার চার নম্বর পেগ চলছে। এক এক পেগ হুইস্কি নিচ্ছে আর উদ্দ্বল হয়ে উঠছে। ব্যাকলেস টপে আলো আঁধারী কৌরিতা লাস্যময়ী, সুজাত তার সাথে আর পা মেলাতে পারছে না। ওয়েস্টার্ন মিউজিকের তালেতালে কৌরিতার পা যেন আপনা আপনি নেচে উঠছে। ভুল হচ্ছে সুজাতের। স্টেপ জ্যাম্প বারে বারে। সবে সাবালক হওয়া কলকাতা যেন ভেঙে পড়েছে নীল রাত্রির ইশারায়। জোড়া পাখিদের উৎসব। সপিং মল, মাল্টিপ্লেক্সে যাওয়ার মতো নাইট ক্লাবেও জলবৎ তরলং। কৌরিতাকে যত দেখছে অবাক হয়ে যাচ্ছে সুজাত। কৌরিতাকে নিয়ে আগে কখনও নাইট ক্লাবে আসেনি। বরঞ্চ এই নিয়ে সুজাতের বাইশবার। কখনও স্ট্যাগমান। কখনও বা কাপেল। প্রতিবারই যোগাড় হয়ে গেছে কোনো না কোনো সুন্দরী রমণী। নাইট ক্লাবে নিজের বউ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুজাতের মধ্যে একটা অদৃশ্য লক্ষ্মণরেখা কাজ করে। আর যখন পয়সায় মেলে যুবতী পার্টনার। কিন্তু এই কৌরিতা তার বড় অচেনা, অজানা। সুজাতের বাহুর মধ্য থেকে কৌরিতা এগিয়ে গেল আংলো চেহারার একটি মেয়ের দিকে—হায় অ্যালেন।

—হোয়াট অ্যা সারপ্রাইজ। আফটার লং ডেস ব্যাক—বলেই কৌরিতাকে জড়িয়ে ধরে কোমর দোলাতে লাগল অ্যালেন। মাইক্রো মিনি টিউব টপে শরীরে সমস্ত বাড়তি অংশে উগ্র হিন্দোল। কোমরের নীচের অংশ যেন তানপুরা। সুজাতের চোখে প্রত্যেকটি জিনিসের দু'তিনটি বিম্ব হয়ে যাচ্ছে। সুজাত বরাবরই মাল্টি ইমেজ আসার আগে পেগ নেওয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এখন চায় না হুইস্কির ফোয়ারা শেষ হোক। সুজাতের চোখে কৌরিতার মুখ এক থেকে বহু হয়ে যাচ্ছে। তখনই অ্যালেনকে সরিয়ে দিয়ে অন্য একটি মেয়ের বুক থেকে এক যুবককে প্রায় চিলের মতো ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল কৌরিতা—মাই ডিসুজা, কতদিন পরে তোমার সাথে দেখা। ডিসুজার কোমর জড়িয়ে নাচতে লাগল কৌরিতা। কৌরিতার সমস্ত শরীর ডিসুজার বন্ধনে। সুজাত ঘোরের মধ্যেও বুঝতে পারছে এ হল আসল ক্যাসিনোভা। মত্ত হরিণটা কোনোভাবে ম্যানেজ করে ঢুকেছে ক্লাবে। কিন্তু ডিসুজা কৌরিতার হঠাৎ দেখা কোনো পুরুষ নয়। কৌরিতার সমস্ত শরীর নগ্ন হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে।

কৌরিতার খেয়াল নেই ব্যাকলেস টপ অনেকটা নেমে গেছে, নগ্ন স্তনদ্বয় ডিসুজার পৌরুষ বুকে দলমথা ঘাস। সেই অবস্থায় যেন কৌরিতা প্রলয় নৃত্য নেচে যাচ্ছে আর নিমেষে শেষ করে দিচ্ছে একের পর এক পেগ হুইস্কি-রাম। সুজাতের মাথায় খুন চেপে যাওয়ার মতো অবস্থা। টালমাটাল পায়ে এক ধাক্কায় সরিয়ে দেয় ডিসুজাকে। কৌরিতাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় গেটের দিকে—না, আমি কিছুতেই যাব না। সব কিছু ধ্বংস করে দেব। কৌরিতার জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। আর প্রাণপণে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

তিন

স্টিয়ারিং হাতে সজাত টের পায় স্রোতের মতো একটা অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে শরীরে। রিপোর্ট পাওয়ার পরই ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছিল। আনন্দ উপভোগের দরকার একটা সাময়িক নির্জনতা। বিয়ের প্রায় দশ বছর বাদে কনসিভ করেছে কৌরিতা। কোটি মানুষের দেশে এমন মুহূর্ত তো কত লোকের জীবনেই আসে। তবু অনুভূতিটা একান্তই তার একার। বাড়ুক না আর একটি মানুষ একশো কোটির দেশে। আলোবাতাস দেওয়ার মতো সামর্থ সুজাতের আছে। গড়িটা দাঁড়িয়ে গেল সাইন্স সিটি আইল্যান্ড ক্রসিং সিগনালে। তর সইছে না তার। গাড়িটাকে পারলে তির বানিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় সে কৌরিতার কাছে। কৌরিতা জানুক সুজাত বাবা হতে চলেছে।

কৌরিতা আধশোয়া অবস্থায় ছিল। সুজাত ঘরে ঢুকেই তাকে আড়কোলে তুলে নিয়ে পাক খেতে খেতে বলল—ইউরেকা, ইউরেকা। কৌরি তুমি মা হতে চলেছ। কৌরিতা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। সুজাত প্রথমে ভাবল কৌরিতা আনন্দ না চাপতে পেরে কেঁদে ফেলেছে। কিন্তু কৌরিতার চোখে জলের ধারা থামছে না। সুজাত তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল—

—কৌরি কাঁদছ কেন?

কৌরিতা চোখ বন্ধ করে বলল—যে আসছে সে কাদের সন্তান?

—মানে? আমাদের সন্তান। তুমি এ ধরনের প্রশ্ন করছ কেন? সে কৌরিতাকে খাটের উপর বসিয়ে দেয়।

—হ্যাঁ, তোমার আমার বায়োলজিক্যাল বেবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পরিচয় কি হবে?

—ইউ আর টকিং ননসেন্স। তোমার আমার সন্তান হলে আমাদের পরিচয়ই তার পরিচয়। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

—আচ্ছা সুজাত, তুমি গত ফরটিনথ মে কোথায় ছিলে রাত দশটায়। কৌরিতা মাথা তুলে সুজাতের দিকে তাকায়।

সুজাত খানিকটা থতমত খেয়ে বলে—কেন, কেন, আমাদের কোম্পানীর ইস্ট এশিয়া ডেলিগেটস মিট ছিল তাজে। সেখানে ছিলাম।

—ডেলিগেট্‌স মিট শেষ হয়েছিল চারটের সময়। রাত দশটায় তুমি ছিলে ডায়মন্ড হারবার রোডে মিস্টার সেনের বাগানবাড়ি প্রিন্সে। মধুচক্রে। মধুচক্রটা মিঃ অ্যান্ড মিসেস সেন চালায়। রিসর্ট টাইপের বাড়ির দোতলায় বসেছিল আসর। শুধু তোমার জন্য বসানো হয়েছিল আসর। বাইরের কোনো এক ডেলিগেট ছিল তোমার স্পনসর।

সুজাত শামুকের মতো গুটিয়ে যায়। তবু কিছুটা মরিয়া ভঙ্গিতে অস্ফুট স্বরে বাধা দেয়—গল্প বানিও না কৌরি।

—গল্প নয়। তুমি তখন নেশায় বুঁদ হয়েছিলে। তিন চারটে অর্ধ নগ্ন মেয়ে তোমায় ম্যাসেজ করে দিচ্ছিল। সাজিয়ে দিচ্ছিল গ্লাস।

তুমি এসব জানলে কি করে—সুজাতের গলায় আত্মসমর্পণের স্বর।

—আমি ঘরে ঢুকতেই অন্য মেয়েরা চলে গেল। ডিম বাতিতে আলো আঁধারী ঘর। তবু তোমাকে দেখেই চমকে উঠেছিলাম। তোমার কাছে গিয়ে আস্তে করে বললাম—সুজাত বাড়ি চলো। তখন আর একপেগ নিজেই ঢেলে নিলে—কেন বাড়ি যাব?

আমি বললাম—আমি তোমার বউ। তুমি তখন চূড়ান্ত নেশার ঘোরে। খিস্তি দিয়ে বললে—ব্লাডি বাস্টার্ড। বেশ্যাখানায় এলে সবাই সতী সাজতে চায়।

—আমি আর তোমাকে ঘাঁটাতে সাহস পাইনি চিল্লাচিল্লির ভয়ে। পাছে ধরা পড়ে যাই। সেন বাবুরা তো আর জানে না আমি তোমার বিয়ে করা বউ।

তোমার মনে পড়ে আমাদের যে দিন পাকা দেখা হয়েছিল সেদিন প্রশ্ন উঠেছিল আমার চাকরি থাকবে কিনা। মানব সম্পদ উন্নয়নের নামে যে খেলায় মেতেছিলাম অনেকগুলো বছর তাকে কি করে বাদ দিই এক ফুৎকারে। লোভ, লালসা আর নিত্য নতুন মানুষের শরীর পাওয়া নিয়ে কি যে গভীর শয়তান বাসা বেঁধেছিল। ফিরে আসতে চেয়েও পারিনি, বারবার হেরেছি মনের সাথে যুদ্ধে। তুমি যদি স্বৈরাচারী হয়ে আমায় আটকে রাখতে ঘরের কোণে তাহলে হয়ত এমন সংকট আসত না কোনো দিনও। ভবিতব্যই ছিল। কৌরিতা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে দেয়।

—তুমি আমাকে ভোগ করলে অন্য পুরুষেরা যেমন ছিঁড়ে আঁচড়ে দেয় বাজারী মেয়েছেলেদের। অন্য কেউ হলে প্রোটেকশন নিতাম, তোমার সাথে কি নেব। দশ বছর ধরে ঘর করছি একটা বাচ্চা এলো না গর্ভে। আর তুমিও চিনতে পারলে না নিজের বউকে। শুধু একবার শরীরে নাক ঘষতে ঘষতে বলেছিলে কৌরিতার গন্ধ। হ্যাঁ, কৌরিতা এক ধরনের জংলি ফুল। সব ফুলেরই তো গন্ধ থাকে। আমার সারা শরীরে বাসিপচা গন্ধ। সে রাতের জন্য পেয়েছিলাম কড়কড়ে ত্রিশ হাজার

টাকা। আর এমনই কপাল মধুচক্রে বেচা শরীরে নিষিক্ত হল তোমার শুক্রাণু। আগেই বুঝেছিলাম শরীর ভারী হয়ে উঠছে, সন্তান আসছে। নাইট ক্লাবে নেচে ঝরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম পাপ। কিন্তু নাচলেই কি পাপ খসে যায়? তুমিই বল মধুচক্রের এই বাচ্চা আমাদের কে? এর পরিচয় কি?

সুজাতের চোখের সামনে অনেকগুলি তীব্র আলো যেন দপদপ করছে। সাদা-কালো। সবুজ-হলুদ-লাল। লাল আলো ক্রমশঃ ছেয়ে দিচ্ছে আকাশ-বাতাস। হাজার হাজার লাল বাতি নেচে যাচ্ছে মাথার কোষে কোষে। কানের পাশে শতরূপা চিৎকার করে বলছে—লালবাতি এলাকা, লালবাতি এলাকা। বুঝলেন সুজাত, তলিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, মন্দির নিষিদ্ধ এলাকায়। কৌরিতার সন্তান কি করে থাকবে তার বাইরে? ভাঙনের ঘূর্ণাবর্তে সুজাত-কৌরিতা ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে গভীর অতল শূন্যতায়।